بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম-এর মধ্যে সাদৃশ্য

সম্মানিত ভাই ও বোনেরা। আপনাদের সবাইকে ইসলামি নিয়মে স্বাগত জানাচ্ছি "আস্‌সালামু আলাইকুম অ-রাহমাতুল্লাহি অ-বারাকাতুহু।" অর্থঃ "আল্লাহ তায়ালার দয়া, শান্তি ও প্রাচুর্য আপনাদের উপর বর্ষিত হোক।" যীশুখ্রিস্ট একই ভাবে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন "হিব্রুতুস সালামালাইকুম।" (গসপেল অব লুক, অধ্যায়- ২৪, অনুচ্ছেদ- ৩৬) অর্থঃ 'আপনার উপর শান্তি বর্ষিত হোক।' আজকের আলোচনার বিষয় হলো ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। আরবি 'সালাম' শব্দ থেকে, 'ইসলাম' শব্দটি এসেছে এর অর্থ 'শান্তি'। এর আরেকটি অর্থ হলো নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা। এক কথায় 'ইসলাম' হচ্ছে নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে শান্তি লাভ করা। আর যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে সে হলো মুসলমান। অনেকের মাঝেই একটি ভুল ধারণা আছে যে, ইসলাম একটি নতুন ধর্ম, যে ধর্মটি পৃথিবীতে এসেছে ১৪০০ বছর আগে, আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এই ধর্মের প্রবর্তক। সত্যি বলতে ইসলাম পৃথিবীতে সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকেই আছে, যে সময় থেকে আল্লাহ মানুষ জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। আর মহানবী (সাঃ) ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক নন। বরং তিনি হলেন ইসলামের শেষ নবী। কোরআনের সূরা ফাতির-এর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا ۔

অর্থঃ "এমন কোনো গোত্র বা সম্প্রদায় নেই যেখানে আমি পথ প্রদর্শক বা সতর্ককারী পাঠাই নি।"

কোরআনে সূরা রাদ- এর ৭নং আয়াতে আল্লাহ বলেন– "আমি প্রত্যেক গোত্রের জন্য পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছি।"

পবিত্র কোরআনে এখানে বলছে প্রত্যেক গোত্র বা সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহ পথ প্রদর্শক পাঠিয়েছেন। কোরআনের সূরা মুমিন-এর ৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ مِنْهُم مَّنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ۔

অর্থঃ "আমি তোমাকে কয়েকজন নবী রাসূলের কথা বলেছি এবং বাকিদের কথা বলিনি।"

তার মানে কোরআনে কয়েকজন নবী রাসূলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে আর বাকিদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র কোরআনে ২৫ জন নবী রাসূলের কথা এসেছে। যেমন– আদম, নূহ, ইসমাঈল, ইসহাক, মূসা, ঈসা, মুহাম্মদ (স)। সকলেই শান্তিতে থাকুক। আর ইসলাম হলো এমন একটা অ-খ্রিস্ট ধর্ম, যে ধর্মের মূলভিত্তির অন্যতম যীশুখ্রিস্টকে নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। সে আসলে মুসলমান নয় যে যীশুখ্রিস্টকে নবী বলে মানে না। আমরা মুসলমানেরা মানি যে তিনি আল্লাহ তায়ালা কর্তৃক প্রেরিত একজন দূত ছিলেন। আমরা আরো মানি যে, তিনি, কোনো পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই অলৌকিকভাবে জন্মেছিলেন যা অনেক আধুনিক খ্রিস্টানও বিশ্বাস করেন না। আমরা মানি যে, তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃতকে জীবিত করে ছিলেন। এবং অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সারিয়ে তুলেছিলেন।

ইসলাম হলো একমাত্র অখ্রিস্টধর্ম যে ধর্মে যীশুকে নবী হিসেবে অবশ্যই মানতে হবে। আমি আগেই বলেছি পবিত্র কোরআনে ২৫ জন নবী ও রাসূলের কথা উল্লেখ আছে। তবে আমাদের নবী মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন প্রায় ১ লাখ ২৪ হাজার নবী রাসূল এ পৃথিবীতে এসেছেন। দেখুন ১ লাখ ২৪ হাজার নবী রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন, কিন্তু কোরআনে এসেছে ২৫ জনের নাম। তবে এসব নবী রাসূল পৃথিবীতে এসেছেন মুহাম্মদ এর পূর্বে। তারা এসেছিলেন শুধুমাত্র তাদের সম্প্রদায়ের জন্যে। আর তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ নিয়ে এসেছিলেন তাও ছিল নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে। যেমন পবিত্র কোরআনের সূরা আল ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন–

وَرَسُوْلًا اِلٰى بَنِىْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ .

অর্থ : "আমি ঈসা (আ) কে বনী ইসরাঈলের রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছি।" যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের বলছেন 'তোমরা জেন্টাইলদের পথ অনুসরণ করো না। আর সামারকানদের কোনো নগরে প্রবেশ করবে না। বরং তোমরা ইসরাঈলবাসীদের পথ অনুসরণ কর'। তিনি বলেছেন যে, "আমি এ পৃথিবীতে এসেছি শুধু ইসরাঈলবাসীদের পথ প্রদর্শনের জন্যে।" (গসপেল অভ মেথিও, অধ্যায় : ১৫, অনুচ্ছেদ ২৪ শ)।

তিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন শুধু ইহুদিদের হেদায়াতের জন্যে অর্থাৎ ইসরাঈলবাসীদের জন্যে, পুরো মানব জাতির জন্য নয়। অপরদিকে পবিত্র কোরআনে বর্ণিত রয়েছে যে–

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيّٖنَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا .

অর্থ : মুহাম্মদ (সঃ) তোমাদের কোনো পুরুষের পিতা নন বরং তিনি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল এবং তিনি হলেন শেষ নবী, আর আল্লাহ সব বিষয়ে সব কিছু সম্পর্কে জানেন।" (সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৪০)।

মহানবী (সাঃ) সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর মহানবী (সাঃ) শুধু মুসলমান বা আরবদের জন্য পৃথিবীতে আসেন নি। এসেছেন সমগ্র মনের জাতির জন্য পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে যে–

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ .

অর্থ : "আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্বজগতের রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, সমস্ত সৃষ্টির প্রতি রহমত হিসেবে, সমগ্র মানবজাতির রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।" (সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ১০৭)।

পবিত্র কোরআনে আরো বলছে যে,

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَاۗفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ .

অর্থ : "আমি তো তোমাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।" (সূরা সাবাহ্, আয়াত: ২৮)।

মহানবী (সাঃ) হলেন সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী। আর তিনি শুধু আরব কিংবা মুসলিমদের জন্যে আসেন নি, তিনি এসেছেন সমগ্র মানবজাতির হেদায়াতের জন্যে। আর বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সাঃ) এর পক্ষে ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে, বাইবেলের বুক অভ ডিওটোরনমী, অধ্যায় ১৮শ অনুচ্ছেদ ১৮শ-এ বলা হয়েছে যে, "আমি তাদের ভাইদের মধ্য থেকে একজন নবীকে পাঠাবো যে হবে তোমার মতো এবং তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো, সে

আমার নির্দেশেই কাজ করবে।" এই ভবিষ্যৎ বাণীটি একজন নবীর আগমণের কথা বলছে। আজ অনেক খ্রিস্টানকে আপনারা বলতে শুনবেন যে, এই ভবিষ্যৎ বাণীটি আসলে যীশু খ্রিস্টের আগমণের কথা বলছে। যদি জিজ্ঞেস করেন এটা কীভাবে যীশু খ্রিস্টের আগমণের কথা বলছে? তারা আপনাকে বলবে ভবিষ্যৎ বাণীটি বলছে–

"আমি তাদের মধ্য থেকে একজন নবী পাঠাবো, সে হবে তোমার মতো, অর্থাৎ যে হবে মূসা (আ) এর মতো। যদি সেই নবী মূসার (আঃ) মতো হয় তাহলে বলা যায় সেই নবীর কথাই ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। আর খ্রিস্টানরা বলে যে, ঈসা আর মূসা (আ) দু'জনে একই রকম। এ কথার পক্ষে তারা যুক্তি দেখায় যে, মূসা (আ) ঈশ্বরের একজন নবী আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন ঈশ্বরের প্রেরিত নবী। মূসা (আ) একজন ইহুদি আর যীশুখ্রিস্টও ছিলেন একজন ইহুদি। তাহলে দুজনের মধ্যেই সাদৃশ্য আছে। তখন তাদের জিজ্ঞেস করুন এ দুটি সাদৃশ্যই যথেষ্ট যাতে প্রমাণ হয় যে, ভবিষ্যৎ বাণীটি যীশু খ্রিস্টের কথা বলছে? তারা উত্তরে বলবে অবশ্যই।

এই দুটো সাদৃশ্য দিয়েই যদি এটা প্রমান হয় তাহলে বাইবেলে যত নবীর নাম উল্লেখ আছে যারা মূসা (আ)-এর পরে এসেছেন; যেমন– সলোমান, সীহজায়েল, ডেনিয়েল জোয়েল, জন, হোসেইরা, সবাই ছিলেন ঈশ্বরের নবী, আর সবাই ছিলেন ইহুদি। অর্থাৎ মূসা (আ) এর পরে যে সমস্ত নবীর কথা পবিত্র বাইবেলে উল্লেখ আছে তারা সবাই এ শর্ত দুটো পূরণ করেছেন। যদি ভালো করে লক্ষ করেন দেখবেন, ডিওটোরনমী'র ১৮ নং অধ্যায়ের ১৮ অনুচ্ছেদের এ ভবিষ্যৎ বাণীটি মিলে যায় শুধু সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে। লক্ষ করুন মূসা (আ) এবং মুহাম্মদ (সা) তাদের দুজনেরই স্বাভাবিক জন্ম হয়েছে। তাদের দু জনেরই বাবা এবং মা ছিল। এক্ষেত্রে যীশুখ্রিস্ট আলাদা। তার সম্পর্কে পবিত্র কোরআন বলছে সূরা আলে- ইমরানের ৪৩-৪৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে,

"তিনি অলৌকিকভাবে জন্মেছেন কোন পুরুষের ভূমিকা ছাড়াই। এ কথা আছে বাইবেলে গসপেল অভ মেথিও, অধ্যায়: ১ অনুচ্ছেদ ১৮ এবং গসপেল অভ্ লুক, অধ্যায়: ১ অনুচ্ছেদ ৩৫-এ।

বলা হয়েছে যে যীশু অলৌকিভাবে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার কোনো বাবা ছিল না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হযরত মূসা (আ) এখানে মুহাম্মদ (সঃ) এর মতো, কিন্তু যীশু খ্রিস্টের মতো তিনি নন। তারা দুজনেই (মুহাম্মদ (সা) ও মূসা) বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁদের সন্তান ছিল। বাইবেলের বর্ণনা মতে যীশুখ্রিস্ট বিবাহিত ছিলেন না এবং তার কোন সন্তানও ছিল না। এছাড়াও মুহাম্মদ ও মূসা তাদের দুজনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যীশুখ্রিস্টের স্বাভাবিকমৃত্যু হয়নি।

পবিত্র কোরআনে সূরা নিসার ১৫৭-৫৮ নং আয়াতে এসেছে যে, "আল্লাহ যীশুখ্রিস্টকে তার কাছে তুলে নিয়েছেন, তিনি মারা যাননি। আর চার্চ- এর কথা অনুযায়ী বাইবেল বলছে যে, "যীশুখ্রিস্টকে ইহুদিরা ক্রুশ বিদ্ধ করে হত্যা করেছে।"

দুটো ধর্মগ্রন্থ মতেই তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি। তাহলে হযরত মূসা (আ) কখনোই যীশুখ্রিস্টের মতো ছিলেন না। মূসা (আ) এবং মুহাম্মদ (সা) (দু জনেই শান্তিতে থাকুন) তাদের দুজনকেই তাদের লোকেরা গ্রহণ করেছিল, তাদের কথা মেনে নিয়েছিল। গসপেল অভ জন, অধ্যায় ১, অনুচ্ছেদে ১ এ আছে যখন যীশু এলেন তার লোকেরা তাকে মেনে নিল না। মূসা এবং মুহাম্মদ তারা শুধু আল্লাহর প্রেরিত রাসূলই ছিলেন না তারা রাষ্ট্রের রাজাও ছিলেন। রাজা মানে তারা কাউকে শাস্তি দিতে পারতেন। তারা মৃত্যুদণ্ড দিতে পারতেন। যারা অপরাধ করতো

তাদের শাস্তি দিতে পারতেন। আল্লাহর নবী হওয়ার পাশাপাশি তারা ছিলেন রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ সেই নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে দেশের রাজা। কিন্তু যীশু তার নিজের মুখেই বলেছিলেন (গসপেল অভ জন, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ৩৬) "আমার রাজ্য এই পৃথিবীতে নয় এর অর্থ যীশু পৃথিবীতে কোনো রাজ্যের রাজা ছিলেন না।

তাহলে দেখতে পাচ্ছেন মূসা এবং মুহাম্মদ (সা) দুজনে আসলে এক রকম। কিন্তু মূসা ও ঈসা (আ) এক রকম নয়। তাহলে এ ভবিষ্যৎ বাণীটি মিলে যায় শুধু চূড়ান্ত সর্বশ্রেষ্ঠ ও শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে। এ ভবিষ্যৎ বাণীতে বলা হয়েছে, 'আমি একজন নবী পাঠাবো তোমার ভাইদের মধ্য হতে।' ভাই মানে আত্মীয় আর আমরা জানি ইহুদিরা ও আরবরা একে অন্যের জ্ঞাতি ভাই। ভবিষ্যৎ বাণীতে আরো আছে, তার মুখ দিয়েই আমি কথা বলবো। আমরা জানি মুহাম্মদ আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সমস্ত ওহী পেয়েছিলেন, তিনি সেগুলো তিলাওয়াত করছিলেন যেন সেগুলো তার মুখ দিয়েই বলা হয়েছে। তাহলে এ ভবিষ্যৎ বাণীটি পুরোপুরি মুহাম্মদ (সঃ) এর সাথে মিলে যায়।

আরো একটি ভবিষ্যৎ বাণী আছে বুক অভ আইজায়ার, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ২৯ এ আছে এ কিতাব দেওয়া হবে তাকে যার অক্ষর জ্ঞান নেই। যখন তাকে বলা হবে যে 'পড়'। তখন সে বলবে 'আমি তো পড়তে জানি না।' আমরা জানি যে, প্রথম ওহী যা মুহাম্মদ এর উপর এসেছিল। পবিত্র কোরআনে (সূরা আলাক, আয়াত: ১) উল্লেখ আছে–

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ

"ইকরা" মানে "পড়"।

নবীজি বললেন, "আমি পড়তে জানি না।" আর ঠিক এই কথাটির ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। (ওল্ড টেস্টামেন্টে বুক অভ আইজারার, অধ্যায় ২৯, অনুচ্ছেদ ১২)। -এ এছাড়াও Song of Solomon- এ অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৬)। -এ বলা হয়েছে যে, "তার কথাগুলো খুব মধুর, সব কিছু মিলিয়ে মনোরম।" যদি ভালো করে দেখেন হিব্রু ভাষায় "ইম" শব্দটি দ্বারা সম্মান দেখানো হয়। 'ইম' যেমন 'এলোহিম'। এটা সম্মানের জন্যে সম্মানের বহুবচন। তেমনিভাবে মুহাম্মদ তারপরে 'ইম' তখন নাম হলো 'মুহাম্মাদীম'। অর্থাৎ আমরা দেখি মুহাম্মদ-এর নাম অন্যান্য ধর্মগ্রন্থেও রয়েছে। কিন্তু অনুবাদ করার সময় এখানে বলা হয়েছে, তার কথাগুলা মধুর, সব মিলিয়ে মনোরম। মুহাম্মদী- এর অনুবাদ করা হয়েছে "সব মিলিয়ে মনোরম"। "তিনি আমার প্রিয় পাত্র, আমার বন্ধু, হে জেরুজালেমের কন্যারা।" তাহলে নাম নিয়ে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ এর কথা বলা হয়েছে। এমন কি পবিত্র বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্টেও আছে। তবে কিছু খ্রিস্টান হয়তো বলবে, 'ওল্ড টেস্টামেন্ট আমরা বিশ্বাস করি না, নিউ টেস্টামেন্টর কেই বেশি গুরুত্ব দিই।'

আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর রহমতে নিউ টেস্টামেন্টেও মুহাম্মদ এর উপর ভবিষ্যৎ বাণী রয়েছে। বাইবেলের গসপেল অভ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৬ যীশুখ্রিস্ট তার শিষ্যদের উদ্দেশে বলছেন যে, "আমি পিতাকে বলবো তোমাদের জন্যে একজন পথ প্রদর্শক পাঠাতে। গসপেল অভ জন, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪ এ আছে "যখন আমার পিতা পরামর্শক পাঠাবেন সে আমার প্রশংসা করবে।" এরপর উল্লেখ আছে গসপেল অব জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ৭ এ "আমি তোমাদের সত্যই বলি যে, এটাই উত্তম যদি আমি চলে যাই। যদি আমি চলে না গেলে সেই পরামর্শক আসবেন না।" এখন এই 'পরামর্শক' শব্দটা আপনারা এখনকার বাইবেলে পাবেন এটা তাহল

'পেরাক্লিটস', যটা 'পেরিক্লিটস' শব্দটার অপভ্রংশ। 'পেরিক্লিস' পেরিক্লিটস শব্দটার অর্থ 'যে প্রশংসা করে' বা যার প্রশংসা করা যায়। এ শব্দটার আরবি হলো 'মুহাম্মদ' আর যে প্রশংসা করে তার অর্থ হলো 'আহাম্মদ'। আলহামদুলিল্লাহ, এই দুটো নামই মুহাম্মদ (সাঃ) এর।

পবিত্র কোরআনে আছে যে, "ঈসা (আ) মরিয়মের পুত্র, তাকে পাঠানো হয়েছিল বনী ইসরাঈলের প্রতি রাসূল হিসেবে।" আর তিনি বলেছেন, "আমি সেই আইনকে সমর্থন করতে এসছি যা আমার আগেই এসেছে। আর সুসংবাদ দিচ্ছি আমার পরে আরেকজন রাসূল আসবেন, তার নাম হবে আহমদ।" তাহলে কুরআন বলছে তিনি তার নিজের মুখে এ ভবিষ্যৎ বাণীটি করেছেন। তাহলে মূল শব্দটা হলো 'পেরিক্লিটস' যাকে প্রশংসা করা হয় বা যে প্রশংসা করে এর অপভ্রংশ হলো 'পেরাক্লিটস', যেটার অনুবাদ করা হয়েছে পরামর্শক। আসলে 'পেরাক্লিটস' শব্দটার অর্থ পরামর্শক নয়, এর অর্থ হচ্ছে দয়ালু। এখন এই শব্দটা হোক 'পেরাক্লিটস' বা 'পেরিক্লিটস'– অর্থাৎ প্রশংসা করা যায়. বা প্রশংসা যে করে অথবা দয়ালু বা পরামর্শক। যাই হোক না কেন আলহামদুলিল্লাহ, এর সবগুলো নাম হযরত মুহাম্মদ- এর সাথে মিলে যায়।

এখানে হয়তো কিছু খ্রিস্টান বলবে যে, এ ভবিষ্যৎ বাণীটি আসলে পবিত্র আত্মার কথা বলছে। নবী মুহম্মদ (সা) এর কথা বলা হচ্ছে না। কিন্তু ভবিষ্যৎ বাণীটি ভালো করে লক্ষ করুন "এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম যদি আমি চলে যাই। কারণ আমি না গেলে সেই পরামর্শক আসবেন না, আমি চলে গেলেই তিনি আসবেন।" অর্থাৎ সে পরামর্শক তখন পৃথিবীতে আসবেন যদি যীশুখ্রিস্ট পৃথিবী ছেড়ে চলে যান। আর আমরা জানি যে, পবিত্র আত্মা যীশুখ্রিস্টের জন্মের পূর্বেও যেখানে ছিল, যীশু জন্মানোর সময়ও সেখানে ছিল, যীশ ব্যালটাইঞ্জ বাপটাইজ হওয়ার সময়ও সেখানে ছিল। নিশ্চিতভাবে এই পরামর্শক, বাইবেলে যার কথা বলা হচ্ছে তিনি পবিত্র আত্মা নন, কারণ পবিত্র আত্মা তখনো ছিল, যখন যীশুখ্রিস্ট এ পৃথিবীতে বেঁচে ছিলেন।

আরো উল্লেখ আছে (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৬, অনুচ্ছেদ ১২-১৪) যে "আমি তোমাদের উদ্দেশে আরো কিছু কথা বলবো, কিন্তু তোমরা এখন তা মেনে নিতে পারবে না। কারণ সে সত্যের আত্মা আসবে, এবং সে-ই তোমাদের সত্যের দিকে নিয়ে যাবে। সে তার নিজের কোন কথা বলবে না, যে ওহী সে পাবে, তাই সে বলবে। আর সে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেবে, আমার প্রশংসা করবে, সে তোমাদের ভবিষ্যতের কথা বলবে।" এখানে বাইবেলে যে সত্য আত্মার কথা বলছে, এটাও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (সা) এর কথাই বলছে। তাহলে যদি আপনারা বাইবেল পড়েন, এমনকি বাইবেলেও সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী মুহাম্মদ (সা) কথাই ভবিষ্যৎ বাণী করা হয়েছে। পৃথিবতে এ পর্যন্ত অনেকগুলো আসমানি কিতাব এসেছে। ৪টার নাম আমরা জানি; পবিত্র কোরআনে এগুলোর উল্লেখ আছে তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন। তাওরাত নাযিল করা হয়েছে হযরত মূসা (আ)-এর উপর। যাবুর নাযিল করা হয়েছে হযরত দাউদ (আ) এর উপর। ইঞ্জিল নাযিল হয়েছিল ঈসা (আ) এর উপর। আর কোরআন হলো সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব যা নাযিল হয়েছিল সর্বশেষ ও চূড়ান্ত নবী হযরত মুহাম্মদ (সা) এর উপর।

এছাড়াও পৃথিবীতে অনেক আসমানি কিতাব এসেছে, কিন্তু নাম দিয়ে পবিত্র কোরআনে মাত্র ৪টার কথা বলা হয়েছে। নাম না জানা এই সকল আসমানি কিতাবগুলো পবিত্র কোরআনের পূর্বে পৃথিবীতে এসেছিল। কিতাবগুলো ছিল একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের লোকজনের জন্যে। আর সেই কিতাবের নির্দেশগুলো ছিল একটা

নির্দিষ্ট সময় কালের জন্য। তবে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব মহাগ্রন্থ আল-কোরআন শুধু মুসলমান বা আরবদের জন্যে নাযিল করা হয়নি। আল কোরআনের সূরা ইব্রাহিম এর ৫২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ ـ

অর্থ ঃ "এটা মানব সম্প্রদায়ের জন্যে একটা বার্তা, যাতে তারা সর্তক হতে পারে এবং জানতে পারে স্রষ্টা কেবল একজনই এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে।" (সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ৫২)।

তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে সমগ্র মানবজাতির জন্য। এছাড়াও পবিত্র কোরআনে (সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে) উল্লেখ আছে যে, "পবিত্র রমজান হলো সেই মাস যে মাসে পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, এই পৃথিবীতে মানব জাতির পাথ নির্দেশক হিসেবে এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য কারীরূপে।' এছাড়া পবিত্র কোরআনে সূরা যুমার- ৪১ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

اَلَّذِیْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ـ

অর্থ ঃ "আমি তোমাদের প্রতি নাযিল করেছি (অর্থাৎ মুহাম্মদ এর প্রতি) এই কিতাব মানব জাতিকে পথ দেখানোর জন্যে এবং সত্য-মিথ্যাকে পার্থক্যকারী রূপে।"

এখানে শুধু মুসলমান বা আরবদের কথা বলা হয়নি, সমগ্র মানব জাতির কথা বলা হয়েছে। তাহলে সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কিতাব নাযিল হয়েছে তামান মানব জাতির জন্যে। আবার পবিত্র কোরআনের পূর্বে নাযিলকৃত আসমানি কিতাবগুলো একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে এসেছিল তাই আল্লাহ তাআলা এগুলোর বিশুদ্ধতার জন্যে কিছু করেন নি। বর্তমানে যে আসমানি কিতাবগুলো আছে তার মধ্যে যেটা পূর্বের মতোই অবিকৃত আছে সেটা হলো পবিত্র কোরআন। আর উইলিয়াম মুর যিনি ইসলামের একজন কড়া সমালোচক, তিনি বলেছেন, "আর কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই যা ১২০০ বছর ধরে। পবিত্র কোরআনের মতো বিশুদ্ধতা অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছে। তিনি একথা বলেছেন ২০০ বছর আগে। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন যে, "ইসলাম দাঁড়িয়ে আছে ৫টি স্তম্ভের উপর।" (সহীহ্ বুখারী, খণ্ড ১, হাদীস নং ৭)

প্রথমটি হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ'। (আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর প্রেরিত রাসূল।) ২য়টি হলো 'সালাত', ৩য়টি 'যাকাত', ৪র্থটি 'হজ্জ' এবং ৫মটি হলো 'রোজা'।

প্রথমটি হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। এটা হলো আল্লাহ সম্পর্কে একটি ধারণা। পবিত্র কোরআনে (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৭) এ উল্লেখ আছে যে, পূর্ব বা পশ্চিমে তোমাদের মুখ ফেরানোতে পুণ্য নেই, তবে পুণ্য আছে সেখানে, যদি আল্লাহকে বিশ্বাস করো। মৃত্যু পর পরবর্তী জীবনকে বিশ্বাস করো, আসমানি কিতাব সমূহকে বিশ্বাস করো। ফেরেশতাদেরকে বিশ্বাস করো, নবীদেরকে বিশ্বাস করো, আর বিশ্বাস করো তকদীরে।"

সূরা আল ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْـًٔا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ : "বল হে কিতাবের অনুসারীরা, (ইহুদি ও খ্রিস্টানেরা) এসো সেই কথায় যা আমাদেরও তোমাদের মাঝে এক। আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা করি না, আমরা কোনো কিছুকে তার শরীক সাব্যস্ত করি না, আমাদের মধ্য হতে কাউকে ঈশ্বর বলে স্বীকার করি না। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো উপাসনা করি না, যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমরা মুসলিমরা নিজেদের সমর্পণ করি আল্লাহর কাছে।"

পবিত্র কোরআনের এ আয়াত আমাদের নির্দেশনা দিচ্ছে যে, কীভাবে আহলে কিতাবদের সাথে (ইহুদি ও খ্রিস্টান) কথা বলতে হবে। "এসো সেই কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে এক" প্রথম সাদৃশ্যটা কী? আল্লাহ ব্যতীত আমরা আর কারো উপাসনা করি না। কোরআনের শেষ পারা সূরা ইখলাসে মহান আল্লাহর ধারণা সম্পর্কে খুব সুন্দর একটি সংজ্ঞা আছে−

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ـ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ـ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ـ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدًا ـ

অর্থ : "বল তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়। তিনি অবিনশ্বর এবং চিরস্থায়ী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কারো থেকে জন্ম নেননি। তার সমতুল্য আর কেউ নেই।"

এই হলো পবিত্র কোরআনের ভাষ্য মতে আল্লাহ তাআলার ৪ লাইনের সংজ্ঞা। যদি কেউ নিজেকে ঈশ্বর দাবি করে এই সংজ্ঞার সাথে মিলে যায়, তাহলে আমাদের মুসলিমদের কোনো আপত্তি থাকবে না তাকে ঈশ্বর বলে মেনে নিতে। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ৪৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে−

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ۚ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرٰى اِثْمًا عَظِيْمًا ـ

অর্থ : "আল্লাহ তায়ালা তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আর যে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করল সে তো এক মহাপাপ করল।"

আল্লাহ চাইলে যেকোনো অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু আল্লাহর সাথে শরীক করা কখনোই ক্ষমা করবেন না। পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১১৬ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন−

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَآءُ ـ

অর্থ : "আল্লাহ তার সাথে শরীক করাকে কখনো ক্ষমা করবেন না। এছাড়া অন্যান্য অপরাধ তিনি চাইলে ক্ষমা করে দেবেন। আর যে শরীক করল সে তো গোমরাহীর পথে অনেক দূর চলে গেল।"

আল্লাহর সাথে শরীক করলে তিনি কখনো ক্ষমা করবেন না। তার মানে 'শিরক'। আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা হলো ইসলামে সবচেয়ে বড় গুনাহ। একই কথা পবিত্র বাইবেলে (বুক অভ্ হেক্রোডাজ ওল্ড টিক সেস্টামেন্ট, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৩-৫) আছে। "আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো মূর্তি তৈরি করো না। উপরের আকাশ থেকে নিচের পৃথিবী থেকে, আমার প্রতিমূর্তি তৈরি করো না। অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর অতিশয় ঈর্ষাপরায়ণ। একই কথা আছে বুক অব ডিওটরনমী অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৭৯- এ 'তোমরা আমার পাশাপাশি অন্য কারো উপাসনা করবে না, আমার উপাসনা করতে গিয়ে কোনো প্রতিমূর্তি তৈরি করবে না।'

"উপরের আকাশমণ্ডলি" থেকে নিচের পৃথিবী থেকে অথবা সমুদ্র থেকে, তাদের সামনে নতজানু হয়ো না, তাদের সেবা করো না। কারণ আমি তোমাদের প্রভু খুবই ঈর্ষা পরায়ণ।" তার মানে মহান প্রভুর প্রতিমূর্তি তৈরি করা ও তার সামনে নতজানু হওয়া পবিত্র বাইবেলে স্পষ্ট করে বারণ করা হয়েছে। আমার আলোচনার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম (সূরা আল মায়িদাহ, আয়াত নং ৭২) -এ "অর্থাৎ তারা কুফরি করছে, ধর্মের অবমাননা করছে, যারা একথা বলে যে, মরিয়মের পুত্র ঈসা (আ) তিনি হলেন আল্লাহ।" তারা কুফরী করেন যারা দাবি করেন যে ঈসা (আ) হলেন আল্লাহ।

অথচ ঈসা (আঃ) তার জাতিকে বলেছেন, "হে নবী ইসরাঈল, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, তিনি আমার এবং তোমাদের প্রতিপালক, যে আল্লাহর সাথে অন্য কারো শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্যে জান্নাত অবশ্যই হারাম করে দেবেন। সে বেহেশতের প্রবেশ করতে পারবে না এবং তার স্থান হবে জাহান্নামে, জালিমদের জন্যে কোনো সাহায্যকারী নেই।" কিছু খ্রিস্টান আছেন যারা বলবেন যে, যীশু নিজেই বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" তিনি বলেছেন যে, তিনি ঈশ্বর। সত্যি কথা বলতে আপনারা যদি বাইবেল পড়েন, দেখবেন একথা স্পষ্ট করে যীশু একবারও বলেননি। গোটা বাইবেলের কোথাও পাবেন না, যেখানে যীশুখ্রিস্ট স্পষ্ট করে, নিজের মুখে বলেছেন, "আমি ঈশ্বর" আমার উপাসনা করো। যদি কোনো খ্রিস্টান পবিত্র বাইবেলের কোনো অনুচ্ছেদ দেখাতে পারেন যাতে প্রামান হয় যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছেন যে, 'আমি ঈশ্বর এবং আমার উপাসনা কর' তবে তখন থেকেই আমি খ্রিস্টান হয়ে যাবো। আমি এ কথাটা অন্যান্য মুসলমানদের হয়ে বলছি না, যেহেতু আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র, আমি বাইবেল পড়েছি, আমি আমার গর্দানকে শিরোচ্ছেদ যন্ত্রের (গিলোটিনের) নিচে দিতে রাজি আছি।

আপনারা যদি বাইবেল পড়েন দেখবেন, যীশু তার নিজের মুখে বলেছেন, পবিত্র বাইবেলের গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদে ২৮ আছে যে, "আমার পিতা আমার চাইতে অনেক বড়।" আর (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ২৯) "আমার পিতা সবার চাইতে বড়।" (গসপেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় ২৯)।

"আমি ঈশ্বরের আত্মার সাহায্যে শয়তানকে বিতাড়িত। (গসপেল অভ্ লুক, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ২০) আমি শয়তানকে বিতাড়িত করি ঈশ্বরের আঙুলের সাহায্যে।" (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০) "আমি আমার নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারি না, আমি সবকিছু শুনে বিচার করি, আর আমার বিচার সঠিক। কারণ, আমি আমার ইচ্ছাটাকে দেখি না, পিতার ইচ্ছাকে দেখি।" যীশু বলেছেন, "আমি নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারি না। তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেন নি। পবিত্র কোরআনে আছে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'কেউ যদি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ তার জান্নাত হারাম করবেন।' পবিত্র কোরআনে সূরা 'ইসরা'র ১১০ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوِ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَّا تَدْعُوْا فَلَهُ الْاَسْمَآءُ الْحُسْنٰى ـ

অর্থঃ "তোমরা তাঁকে আল্লাহ নামে ডাকো অথবা রহমান নামে তোমরা তাঁকে যে নামেই ডাকো সব সুন্দর নামগুলোই তার।"

আমরা আল্লাহকে যেকোনো নামে ডাকতে পারি, তবে সেটা হবে একটা সুন্দর নাম। এ নামে আপনার মনে কোনো ছবি ভেসে উঠবে না। আর পবিত্র কোরআনে সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকা হয়েছে। যেমন–

রহমান, রাহিম, আল-হাকিম, পরম করুণাময়, পরম দয়ালু, সর্বজ্ঞ। সব মিলিয়ে ৯৯টি নামে তাঁকে ডাকার কথা বলা হয়েছে। আর একথাটা আরো আছে (সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৮০), (সূরা ত্বা-হা, আয়াত নং ৮), (সূরা হাশর, আয়াত নং- ২৪), যে, "সবচেয়ে সুন্দর নামগুলো যেগুলো আল্লাহ্ সুবহানাহু তাআলার।"

এখন কথা হচ্ছে আমরা মুসলমানরা আল্লাহকে কেন আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি, ইংরেজিতে 'গড' বলে ডাকি না কেন? আল্লাহ একটা বিশুদ্ধ শব্দ ও একক। ইংরেজিতে God শব্দটিকে অনেকভাবে বিকৃত করা যায়, যেমন যদি God-এর পরে একটা s যোগ করেন সেটা হয় Gods, God-এর বহুবচন। কিন্তু 'আল্লাহ' শব্দটার কোনো বহুবচন ইসলামে নেই। 'কুলহু আল্লাহু আহাদ'। 'বল, তিনি আল্লাহ এক এবং অদ্বিতীয়'। God-এর পরে es যোগ করলে হবে Godes. একজন মহিলা God, পুরুষ আল্লাহ বা মহিলা আল্লাহ বলে কিছু ইসলামে নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কোনো লিঙ্গ নেই। God এরপরে father যোগ করলে হবে God father, যে আমার God father 'আমার অভিভাবক।' 'আল্লাহ ফাদার' বা 'আল্লাহ আব্বা' এমন কিছু ইসলামে নেই। 'আল্লাহ' একটা মৌলিক শব্দ। God-এর সাথে Mother যোগ করলে হবে God-Mother. 'আল্লাহ মাদার' বা 'আল্লাহ আম্মা' বলে কিছু ইসলামে নেই। যদি গডের আগে 'টিন' শব্দটা লাগান তবে হয় 'টিন গড'। 'টিন আল্লাহ' বলে কিছু নেই ইসলামে।

তাই আমরা মুসলমানরা আমাদের রবকে আরবিতে 'আল্লাহ' বলে ডাকি। 'গড' বলে ডাকি না। তবে যখন অমুসলিমদের সাথে কথা বলার সময় যদি তারা 'আল্লাহ' শব্দটার মানে না বুঝে তখন যদি ইংরেজি God ব্যবহার করা হয় তবে কোনো আপত্তি নেই। তবে আল্লাহকে ডাকার সঠিক পদ্ধতি হলো 'আল্লাহ' শব্দটাই। God শব্দটা এখানে সঠিক অনুবাদ নয়। আর এই 'আল্লাহ' নামটা আপনারা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে দেখতে পাবেন। বাইবেলেও আছে। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্টে দেখবেন যে, সেখানে ঈশ্বরকে যে নামে ডাকা হয়েছে সেটা হলো 'এলোহিম' 'এলা' অর্থাৎ 'ঈশ্বর', 'ইম' হচ্ছে সম্মানার্থে বহুবচন 'এলোহিম'। যদি আপনারা বাইবেল অনুবাদ পড়েন (ব্রাদার স্করফিট) তিনি এই এলাহকে লিখেছেন Elah অথবা আরেকটি বানান হলো Allah (এলাহ্)। তাই দেখতে পাচ্ছেন যে, ভাই স্করফিটও একমত যে, উচ্চারণে সিামান্য পার্থক্য রয়েছে। তারা বলেন 'এলাহ্' আর আমরা বলি 'আল্লাহ্'। উচ্চারণ ভিন্ন তবে শব্দ দুটি এক। এরপরে যীশুখ্রিস্টকে যখন ক্রুশে চড়ানো হলো, বাইবেলের কথা অনুযায়ী (গসপেল অভ মেথিও, অধ্যায় ২৭, অনুচ্ছেদ ৪৬), (গসপেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ৩৪) যে, "যখন যীশুখ্রিস্টকে ক্রুশে চড়ানো হলো তখন তিনি বলেছিলেন "এল্লাই এল্লাই লামা সানক্তানি।"

কথাটা বাইবেলের প্রতিটি অনুবাদেই রয়েছে, ইংরেজি, হিন্দি মালায়িলাম, কর্নাটিক অনুবাদে এই হিব্রু উদ্ধৃতি "এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি" যেখানে আছে, তারপরে লেখা আছে, তিনি বললেন, 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?' আমি আপনাদের প্রশ্ন করি, হিব্রু ভাষায় যীশুখ্রিস্ট যখন বলেছিলেন, 'এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি।' কথাটি কি এমন শোনায়? 'হে ঈশ্বর! হে ঈশ্বর! কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে?' এটি একই রকম লাগে? এই এল্লাই এল্লাই লামা সাবাক্তানি কি এমন শোনায় যে, 'যোহা যোহা কেন তুমি আমাকে পরিত্যাগ করলে? এই বাক্যটি কি এমন শোনায় যে, 'যীশু যীশু কেন তুমি আমাকে ত্যাগ করলে?' বরং যদি এটার আরবি অনুবাদ করেন তাহলে হবে 'আল্লাহ্ আল্লাহ্ লামা তারাক্তানি।'

আরবি এবং হিব্রু একই ধরনের ভাষা, এখানেও শুনতে একই রকম শোনায়। তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছেন, বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী যখন তাকে ক্রুসে চড়ানো হয়েছিল তিনি তখন বলেছিলেন, 'আল্লাহ'। সে জন্যে আমরা মুসলিমরা স্রষ্টাকে 'আল্লাহ' নামে ডাকি। ইংরেজিতে God বলি না বা অন্য কিছু ও বলিনা। যীশুখ্রিস্ট ঠিক এ নামেই ডেকে ছিলেন।

ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ হলো সালাত। বাংলায় অনেক সালাতের অনুবাদ করেন 'প্রার্থনা', প্রার্থনা দিয়ে পুরোপুরি 'সালাত' এই আরবীটাকে প্রকাশ করা যায় না। কারণ প্রার্থনা করা মানে সাহায্য চাওয়া, মিনতি জানানো, আপনি আদালাতে কীভাবে আবেদন করেন, কীভাবে সাহায্যের জন্যে আবেদন করেন। সালাতে আমরা প্রার্থনার পাশাপাশি আল্লাহ তায়ালার প্রশংসাও করি। আর এক সাথে আমরা তার নির্দেশও পালন করি। প্রার্থনা দিয়ে সালাতকে পুরোপুরি বুঝানো যায় না। প্রার্থনা মানে শুধু সাহায্যের জন্য আবেদন, আর সালাতে আমরা সাহায্যের পাশাপাশি তার প্রশংসা করি এক সাথে তার নির্দেশও মেনে চলি।

যদি প্রশ্ন করেন, আমি বলবো, সালাত অনেকটা ঠিক প্রোগ্রামিং এর মতো, এক ধরনের অভ্যাস। এখন যদি কেউ আমাকে বলে, আপনি কোথায় যাচ্ছেন, আমি যদি বলি প্রোগ্রামিং- এ যাচ্ছি তাহলে উত্তরটা অদ্ভুত শোনাবে। এ জন্যে কেউ যদি প্রার্থনা শব্দটা ব্যবহার করে আমার কোনো আপত্তি নেই, বাংলায় 'প্রার্থনা' আরবি সালাতের অনুবাদ। তবে আপনাদের পরিষ্কার ভাবে বলব যে, 'প্রার্থনা' শব্দ দিয়ে আরবি সালাতের পুরো অর্থ প্রকাশ পায় না। কেন আমি বললাম যে, সালাত অনেকটা প্রোগ্রামিং এর মতো। কারণ সালাত আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। যেমন ধরুন, মসজিদে যখন ইমাম সূরা ফাতিহা পড়ে, এরপর হয়তো সূরা মায়িদা পড়বেন, মায়িদার ৯০ নং আয়াত পড়বেন, সেখানে বলা হচ্ছে যে, পবিত্র কোরআন বলছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

অর্থ : "হে মুমিনগণ! নিশ্চয় মদ এবং জুয়া ঘৃণ্য বস্তু, মূর্তি পূজার বেদি এবং ভাগ্য নির্ণায়ক স্তর, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো তোমরা পরিত্যাগ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

আজ এখানে মহান আল্লাহ আমাদের পথ দেখাচ্ছেন যে, মদ, জুয়া মূর্তিপূজা, ভাগ্য গণনা, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো ত্যাগ করো যাতে সফলকাম হতে পার। এভাবে সালাতের মধ্যেই আমাদের প্রোগ্রামিং হচ্ছে, সালাত আমাদের নিয়ন্ত্রণ করছে, আমরা অভ্যস্ত হচ্ছি, ইমাম হয়তো সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াত পড়বেন, যেখানে বলা হচ্ছে যে–

"তোমরা বিলাসিতার মধ্যে ব্যয় করো না। আর তোমরা সম্পদ দিয়ে বিচারকদের লোভ দেখিও না, যাতে করে তোমরা অন্যায় ভাবে অন্য কারো সম্পদ গ্রাস করে নিতে পারো।"

পবিত্র কোরআন বলছে ইসলাম ঘুষ দেওয়া ও নেওয়ার অনুমতি দেয় না। আপনি প্রোগ্রামড হয়ে যাবেন যে, ঘুষ জিনিসটা অন্যায় অনৈতিক। পবিত্র কোরআনের (সূরা আনকাবুত, আয়াত নং ৪৫) উল্লেখ আছে যে–

"তুমি পড় কিতাব থেকে, যা তোমার প্রতি নাজিল হয় এবং তুমি সালাত আদায় করো, কারণ নিশ্চয়ই সালাত তোমাকে যাবতীয় অশ্লীল এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।"

পবিত্র কোরআন বলছে যে, সালাত আপনাকে যাবতীয় মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় বাধ্যতামূলক। যেমন– ভালো স্বাস্থ্যের জন্যে আপনাকে তিনবেলা খেতে হবে এবং আত্মিক ভালো থাকার জন্যে আপনাকে সালাত আদায় করতে হবে প্রতিদিন অন্তত ৫ বার। পবিত্র কোরআন এর সুরা ত্বাহা আয়াত নং ১১-১২ বলছে–

فَلَمَّا أَتٰهَا نُوْدِيَ يٰمُوْسٰى . إِنِّيْٓ أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى .

অর্থ : "সে যখন আগুনের কাছে এলো একটা শব্দ শুনতে পেল, হে মূসা নিশ্চয়ই আমি তোমার রব, তোমার জুতো খুলে রাখ কারণ, তুমি এখন পবিত্র তুর পাহাড়ে রয়েছে।"

আল্লাহ হযরত মূসা (আ)-কে বললেন, তার জুতো খুলে রাখতে। কারণ জায়গাটি পবিত্র। একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেল। ওল্ড টেস্টামেন্টে (বুক অভ্ হেক্সোডাজ অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৫) বলা হচ্ছে যে, "তুমি কাছাকাছি এসো না। তোমার পা থেকে জুতো খুলে রাখ। কারণ তুমি যেখানে দণ্ডায়মান আছ তা পবিত্র জায়গাটা।" এই কথা বলা হয়েছে বুক অভ্ এক্স এ (অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৩৩)। একজন মুসলিম খালি পায়ে নামাজ আদায় করতে পারে, আর জুতো পরে নামাজ আদায় করতে হলে জুতোর তলা পরিষ্কার করতে হবে। পরিচ্ছন্নতার জন্যে নবীজি বলেছেন যেন নামাজ পড়ার জায়গাটি পরিষ্কার থাকে। পবিত্র কোরআনে (সূরা মায়িদা, আয়াত: ৬) আছে যে–

يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ .

অর্থ : "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নামাযের জন্যে তৈরি হবে, তোমাদের মুখ ধোবে, আর তোমাদের হাত ধোবে কনুই পর্যন্ত, পানি দিয়ে তোমাদের মাথা মাছেই করবে, আর তোমাদর পা গোড়ালি পর্যন্ত ধোবে।"

নামায আদায়ে আগে অযু করা ইসলাম ধর্ম মতে বাধ্যতামূলক। আর এক কথা দেখবেন যদি আপনারা বাইবেল পড়েন। এটা আছে বুক অভ্ হেক্সোডাজ, অধ্যায় ৪০, অনুচ্ছেদ ৩১,৩২- এ, "আদম তাদের সন্তানদের নিয়ে তাদের হাত ও পা ধুয়ে নিল, আর যখন তারা মন্দিরে প্রবেশ করলো, যেখানে তারা প্রভুর সামনে যাওয়ার আগে হাত পা ধুয়ে নিল।" এটা আছে বুক অভ্ এক্স এ অধ্যায় ২১, অনুচ্ছেদ ২৬ এ, "পল অন্যান্য লোকদের সাথে পরের দিনে পরিচ্ছন্ন হয়ে তারপর প্রভুর সম্মুখে গেল।" তাহলে অযু করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ আমরা মুসলিমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জাতি। আমরা পরিষ্কার থাকতে চাই, আর এটার পাশাপাশি এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি। ফাইনাল পরীক্ষার আগে যেমন টেস্ট হয়। প্রভুর সামনে দাঁড়ানোর আগে এটা একটা মানসিক প্রস্তুতি।

খ্রিস্টানরা এমন জাতি যাঁরা যীশুখ্রিস্টের বিভিন্ন নির্দেশাবলি মেনে চলে, এক্ষেত্রে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। কারণ আমরা বাইবেলকে বেশি মানি। বাইবেল যেভাবে বলেছে নামায আদায়ের সময়, আমরা সেভাবে অযু করি। এছাড়াও সহীহ্ বুখারী, খণ্ড নং ১, বুক অভ্ আযান , অধ্যায় ৭৫, হাদিস নং ৬৯২-এ আছে 'হযরত আনাস (রা) বলেছেন, যখন আমরা নামাযে দাঁড়াতাম একজনের কাঁধ আরেকজনের সাথে লেগে যেত, একজনের পা অন্যজনের পায়ের সাথে মিলে যেত।" আমাদের নবী আরো বলেছেন, (আবু দাউদে, খণ্ড নং ১, বুক অব সালাত, অধ্যায় ২৪৫, হাদীস নং ৬৬৬) যে,

"নামাযের কাতারে তোমরা সবাই সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াও কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে মাঝখানে কোনো ফাঁকা রেখ না, ফাঁকাগুলো পূরণ করো, শয়তানের প্রবেশের কোনো পথ রেখো না।"

নবীজি এমন কোনো শয়তানের কথা বলছেন না যেমনটি আমরা টিভিতে দেখি দুটি শিং আর একটি লেজ। নবীজি যে শয়তানের কথা বলছেন সেটা হচ্ছে জাতি গত, গোত্র গত, বর্ণ গত অহংকার। যারা নামায পড়ছে তারা ধনী বা গরিব, অথবা হোক ফকির; যখন নামাযে দাঁড়ায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। যারা নামায পড়ছে হোক সে সাদা বা কালো, বাদামি বা হলুদ, নামায পড়ার সময় সকল কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াবে। এই হলো আমাদের নবীজির শিক্ষা। আর নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ অংশ হলো সিজদা করা। আর মনোবিজ্ঞানীরা আমাদের বলেন যে, আমাদের মন পুরোপুরি আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না, আমাদের শরীর আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, আমি চাইলে আমি আমার হাত ওঠাতে পারবো, আবার নামাতে পারবো। এক পা সামনে যেতে পারবো, আবার আসতে পিছনে পারবো। আমাদের শরীর সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু মন সব সময় ঘুরে বেড়ায়, মন সব সময় আমাদের নিয়ন্ত্রণে থাকে না।

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, মনকে যদি নিয়ন্ত্রণ করতে চান তাহলে আপনার শরীরটাকে বিনীত করতে হবে। এর জন্যে ভালো উপায় হলো শরীরের সবচেয়ে উঁচু অংশটা অর্থাৎ কপাল একেবারে মাটিতে লাগিয়ে দিন এবং বলুন 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি সবার উপরে'। আর বাইবেলেও ঠিক একই পদ্ধতির উল্লেখ আছে ওল্ড টেস্টামেন্টে। নিউ টেষ্টামেন্টেও আছে (বুক অভ্ জেনোসিজ, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ৩) যে, "ইব্রাহীম মাটিতে মাথা ঠেকিয়েছেন" এছাড়াও (বুক অভ্ নাম্বারস, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ৬) মূসা আর হারুন মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে।" (বুক অভ্ যসোয়া, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৪), যসোয়া মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রার্থনা করেন।

আর নিউ টেস্টামেন্টে উল্লেখ আছে যীশু যখন গেতমামেনের বাগানে পৌঁছলেন (গসপেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ২৬, অনুচ্ছেদ ৩৯) "যীশুখ্রিস্ট কয়েক পা সামনে এগুলেন এবং মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন।" এমনকি একজন সার্কাসের লোক ভালোভাবে পারবে না মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরের প্রার্থনা করতে, যেভাবে আমরা মুসলিমরা করি। এখানে নিয়মটা একই যেভাবে যীশুখ্রিস্ট প্রার্থনা করেছিলেন।

ইসলামের ৩য় স্তম্ভটা হলো যাকাত। এটা একটা আরবি শব্দ, যার অর্থ বিশুদ্ধ করা, বেড়ে যাওয়া। আর প্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যেক মুসলিম, যারা ধনী, সম্পদশালী আর যাদের সঞ্চয় তাদের নিসাবের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ, ৮৫ গ্রাম স্বর্ণ, তারা তাদের সঞ্চয়ের ২.৫০% প্রত্যেক হিজরি সালে অসহায় ও গরিবদের মাঝে দান করে দেবেন। এটা আবশ্যিক। আর প্রত্যেক সম্পদ শালীর জন্যে যাকাত দেওয়া ফরজ। এটা আছে পবিত্র কোরআনের সূরা তাওবা, ৬০ নং আয়াত–

إِنَّمَا الصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَٰكِينِ وَالْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔

অর্থ : যাকাত পাবে ফকির, দাস, গরিব, ধনী, মুসাফির, মিসকিন, অভাবী, যেসব লোক সবার কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহ করে। যারা অন্য ধর্ম থেকে এসেছে ইসলাম ধর্মের পথে, দাসদের মুক্তির জন্যে যাকাত দেওয়া যায়। যাকাত পেতে পারে মুসাফির, যেসব লোক বিদেশে অবস্থান করে অথবা আল্লাহর পথে চলে।

যদি পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষ যাকাত আদায় করে তবে, পৃথিবীতে দারিদ্র্য বলে আর কিছু থাকবে না। তখন একজন মানুষও আর না খেয়ে মারা যাবে না। ঠিক একই ধরনের কথা আছে পবিত্র বাইবেলে (ফার্স্ট পিটারস, অধ্যায় ৪, অনুচ্ছেদ ৮) যে "তোমরা দান করো, দান করলে অপরাধের মাত্রা কমে যায়।"

আর পবিত্র কোরআন বলছে (সূরা আল-হাশর, আয়াত- ৭) যে–

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْ ؕ

অর্থ ঃ "ধনীদের ঐশ্বর্য কেবল তাদের মধ্যেই আবর্তন হবে না।"

আবার সূরা তাওবা, আয়াত নং-৩৫- এ উল্লেখ আছে যে, "কিছু লোক আছে যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে না। তাদেরকে মর্মবিদারী শাস্তির সংবাদ দাও; তাদের সম্পদে জাহান্নামের আগুন থেকে আগুনের উৎপন্ন হবে, আর সেগুলো দিয়ে কিয়ামতের দিন দাগ দেওয়া হবে তাদের পিঠে, কপালে এবং সামনে আর তাদের বলা হবে এই সম্পত্তি তোমরা জমিয়েছিলে, এখন এ সম্পত্তির স্বাদ তোমরা গ্রহণ করো।" নিজের স্বার্থে জমিয়ে রাখা অনুমতি ইসলামে নেই।

ইসলামের ৪র্থ স্তম্ভটি হলো হজ্জ। প্রাপ্ত বয়স্ক সামর্থ বান প্রত্যেক মুসলিম জীবনে অন্তত একবার মক্কায় হজ্জে যাবেন, তারপর মিনায়, আরাফায় ইত্যাদি জায়গায়। আর এটা সবচেয়ে বড় ইসলামি সম্মেলন, প্রতি বছর প্রায় ২৫ লক্ষ মানুষ মক্কায় আসেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ভারত, মালয়েশিয়া, সিংগাপুর পাকিস্তান প্রভৃতি দেশ থেকে তারা আসেন। আর পুরুষরা পরেন দু-টুকরো সেলাই ছাড়া কাপড় এবং সাদা হলে ভালো। আপনার পাশের লোকটিকে দেখে বুঝতে পারবেন না সে রাজা না ফকির। সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের সবচেয়ে বড় উদাহরণ। পবিত্র কোরআন বলছে (সূরা হুজরাত আয়াত-১৩) যে–

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ۔

অর্থ ঃ "হে মানব জাতি আমি তোমাদের একজন পুরুষ আর একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি, পরে তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে ভাগ করেছি, যাতে তোমরা অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। এজন্যে নয় যে তোমরা একে অপরকে ঘৃণা করবে আর তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদা সম্পন্ন যার রয়েছে অধিক তাকওয়া।"

আল্লাহ আমাদের যে জিনিসটি মানুষকে দিয়ে বিচার করবেন, সেটা লিঙ্গ নয়, সম্পদ নয়, গৌত্র নয়, গায়ের রং নয়, সেটা হচ্ছে তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহকে মানা, ধার্মিকতা আর ন্যায়পরায়ণতা খোদা ভীরুতা।

ইসলামের ৫ম স্তম্ভটি হলো রোজা রাখা। রমযান মাসে প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক মুসলমানেরা সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাদ্য, পানি আর যৌনাচার থেকে বিরত থাকবেন। প্রত্যেক হিজরি সনের রমযান মাসের প্রত্যেক দিন রোযা রাখবেন। আর পবিত্র কোরআনে আছে (সূরা বাকারার, আয়াত নং- ১৮৩) যে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "তোমাদের জন্যে রোযার বিধান দেওয়া হলো, যেমন ভাবে দেওয়া হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর যাতে তোমরা শিখতে পার আত্মসংযম।"

রোযা রাখার বিধান করা হয়েছে যাতে আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। 'আত্মসংযম' করা যায়। বর্তমান মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 'যদি ক্ষুধাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তাহলে বেশিরভাগ আকাঙ্ক্ষাকেই নিয়ন্ত্রণ করা যায়।' একই রকম কথা আছে গসপেল অভ্ মেথিও, অধ্যায় নং ১৭, অনুচ্ছেদ ২১ এবং গসপেল অভ্ মার্ক, অধ্যায় ৯, অনুচ্ছেদ ২৯ এ, "মানুষকে উপবাসের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে" আর রমযান মাসে আপনার চেষ্টা থাকবে যাতে কোনো খারাপ কাজ না করেন, যে খারাপ কাজগুলো সাধারণত অন্য সময় করা হয় রোযার সময় সেগুলো করবেন না।

আর এতে করেই আপনি ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। যে ভালো কাজগুলো অন্য সময় করতেন না রমযান মাসের সময় সেগুলো করবেন এবং এতে করেই আপনি অভ্যস্ত হয়ে যেতে পারেন। যেমন যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধূমপান ত্যাগ করতে পারেন তাহলে জীবনের পুরোটা সময় ধূমপান ত্যাগ করতে পারবেন। যদি আপনি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাদকদ্রব্য সেবন বর্জন করেন, তবে জীবনের পুরোটা সময় তা বর্জন করতে পারবেন। আরো একটা ব্যাপার রোযা রাখলে আমাদের হজম শক্তি বৃদ্ধি পায়।

এগুলো হলো ইসলামের প্রধান ৫টি স্তম্ভ। তবে এই ৫টি স্তম্ভ দিয়ে পুরো ইসলাম ধর্ম তৈরি হয়নি। আমাদের নবী (স) বলেছেন, এগুলো হলো ৫টি মূলনীতি ৫টি ভিত্তি ৫টি স্তম্ভ। আর একজন ইঞ্জিনিয়ার বা আর্কিটেকচার জানেন যে, যদি ভিত্তি স্তম্ভটি শক্ত হয় তবে কাঠামোটা ও শক্ত হবে। যদি কোনো মানুষ এই ৫টি স্তম্ভ সঠিক নিয়মে মেনে চলেন তবে তার অন্যান্য মূলনীতিগুলোও শক্ত হবে।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ـ

অর্থ : "আমি জ্বীন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্য।"

অর্থাৎ আল্লাহ মানুষ ও জ্বীন দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন তার ইবাদত করার জন্যে। আরবিতে 'ইবাদত' শব্দটা এসেছে মূল শব্দ 'আবদ' থেকে। 'আবদ' মানে আল্লাহ তাআলার দাস বা গোলাম। আর এটার অর্থ হলো দাসত্ব। এখানে ইবাদত হলো কোনো একজন মানুষের সেবা। যে তার প্রভুকে মেনে চলবে। কেউ যদি আল্লাহ তাআলার আদেশ নিষেধ মেনে চলে সেটা হলো ইবাদত। অনেকে মনে করে সালাত হলো ইসলামের একমাত্র ইবাদত। কিন্তু এটা একমাত্র ইবাদত নয়, বড় ইবাদতগুলোর একটি। আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চলাটাও একটা ইবাদত। যেমন, আল্লাহ আমাদের জন্যে যে খাবারগুলো হালাল করেছেন সেগুলো যদি যান আর যেগুলো হারাম করেছেন, সেগুলো যদি আপনি না খান সেটাও হবে ইবাদত।

পবিত্র কোরআনের (সূরামায়িদা, আয়াত নং ৩) বলা হয়েছে–

অর্থ : "হে মুমিনগণ নিশ্চয়ই মদ এবং জুয়া ঘৃণ্য, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্য নির্ণয়ক তীর, এগুলো শয়তানের কাজ, এগুলো পরিত্যাগ কর যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

যদি আপনি মাদকদ্রব্য থেকে, মূর্তিপূজা থেকে এবং ভাগ্য গণনা থেকে দূরে থাকতে পারেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। একই ধরনের বাইবেলেও দেখবেন (বুক অভ্ প্রভার্স, অধ্যায় ২০, অনুচ্ছেদ ১) বলা হয়েছে 'মদ একটা প্রতারক' (এফিসেন্স, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ১৮) 'তোমরা মদ খেয়ে মাতাল হয়ো না।" তাহলে বাইবেল বলছে 'মাদক দ্রব্য গ্রহণ করা যাবে না।' নিষিদ্ধ খাবারের ব্যাপারে কোরআন বলছে সব মিলিয়ে ৪টি ভিন্ন ভিন্ন

সূরায় । (সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৩; সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৩; সূরা- আন্-আম, আয়াত নং ১৪৫ এবং সূরা নাহল, আয়াত নং ১১৫)

অর্থঃ "তোমাদের জন্যে মৃত জন্তু, রক্ত, শূকরের মাংস এবং জবাই করার সময় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নাম নেওয়া হয় এমন প্রাণী হারাম করা হয়েছে।"

উপরোক্ত খাবারগুলোকে পবিত্র কোরআন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। যদি আপনারা বাইবেল পড়েন তাহলে দেখবেন (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৫); (বুক অভ্ ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ২১) বলা হয়েছে "তোমরা এমন কোনো পশুর মাংস খাবে না যা জবাই করার আগেই মারা গেছে।" তার মানে মৃত পশুর মাংস খাওয়া যাবে না। রক্ত আরেকটি নিষিদ্ধ খাবার। একই কথা আছে বাইবেলে। বাইবেলে সব মিলিয়ে ৫টি অনুচ্ছেদে বাইবেল রক্ত খাওয়া নিষিদ্ধ বলেছে। (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ১৪; বুক অব ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ২৯) এ আছে "তোমরা রক্ত পান করবে না।"

আরেকটি নিষিদ্ধ খাবার হলো শূকরের মাংস। আর এটার পেছনে অনেক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আমি একটা আলোচনাতেও বলেছি কেন হারাম খাওয়া উচিৎ নয়, কেন শূকরের মাংস খাবেন না। কারণ, এতে আপনার অনেক অসুখ, বিসুখ হতে পারে। এ সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল বলছে, (বুক অভ্ লেবিটিকাস, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৭-৮) যে "যদিও শূকরের খুর দুই ভাগে বিভক্ত, তবুও এরা যাবর কাটে না, এর মাংস তোমাদের জন্যে অপরিচ্ছন্ন। তোমরা এই প্রাণীটার মাংস খাবে না, এর মৃতদেহ স্পর্শ করবে না।" একই কথা আছে বুক অব ডিওটোরনমি, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৮ শূকরের খুর যদিও দুই ভাগে ভাগ করা, তারপরও এরা জাবর কাটে না। তোমরা শূকরের মাংস খাবে না এবং এর মৃতদেহ স্পর্শও করবে না। একই ধরনের কথা আছে বুক অভ্ আইজায়ায়, অধ্যায় ৬৫, অনুচ্ছেদ ২-৪-৫ যে "শূকরের মাংস খাওয়া তোমার জন্যে নিষিদ্ধ। এবং যেটায় আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে।" একই রকম কথা রয়েছে বুক অভ্ এক্স, অধ্যায় ১৫, অনুচ্ছেদ ২৯ এবং রেভ্যুলেশন, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ১৪ -এ, "তোমরা এমন কোন খাবার খাবে না যেখানে অন্য উপাস্যের নাম নেওয়া হয়েছে।" অর্থাৎ মহান ঈশ্বর বাদে অন্য কারো নাম নেওয়া হয়েছে।

লক্ষ্য করুন, আপনারা যদি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে হারাম খাওয়া বর্জন করেন, তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। যদি আপনার প্রতিবেশীকে ভালোবাসেন তাতেও আপনি ইবাদত করছেন। যীশু ও বলেছেন, 'প্রতিবেশীকে ভালোবাস।' পবিত্র কোরআনে (সূরা মাউন, আয়াত নং ১-৭) আছে, "তুমি দেখেছো তাকে যে দ্বীনকে অস্বীকার করে? ইয়াতিমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। অভাবগ্রস্তকে অন্নদানে উৎসাহ দেয় না। দুর্ভোগ সে সমস্ত নামাযির। যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে উদাসীন। যারা তা পড়ে লোক দেখানোর জন্য। আর প্রতিবেশীকে কিছু দিয়েও সাহায্য করে না।" যদি প্রতিবেশীকে সাহায্য করা তাদের ভালোবাস আল্লাহর ইবাদত। যদি ব্যবসায় সৎ থাক আল্লাহর ইবাদত। পবিত্র কোরআনের (সূরা হুমাযাহ্, আয়াত নং ১)- এ আছে যে–

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ –

অর্থঃ "দুর্ভোগ তাদের যারা সামনে ও পেছনে নিন্দা করে।"

যদি আপনি কারো সামনে বা পেছনে নিন্দা না করেন, তাহলে আপনি আল্লাহর ইবাদত করছেন। পবিত্র কোরআন বলছে, "তোমরা পিতা-মাতাকে ভালোবাসো।"

পিতা-মাতাকে ভালোবাসা, শ্রদ্ধা করা ও আল্লাহর ইবাদত। পবিত্র কোরআন বলছে (সূরা ইসরার অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের আয়াত নং ২৩-২৪)−

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ـ

অর্থ : "আমি নির্দেশ দিয়েছি আমাকে ব্যতীত আর কারো ইবাদত কর না। আর পিতা-মাতার সাথে ভালো আচরণ কর, যদি তাদের মধ্যে একজন বা দুজন বার্ধক্যে পৌছে তখন তাদেরকে কোনো রকম ধমক দিও না। এমনকি তাদের সাথে উহ্ শব্দটাও করতে পারবে না। বরং নম্রতা ও ভদ্র ব্যবহার করো। তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করো। আর আল্লাহর কাছে প্রার্থনা কর 'দয়া কর' যেভাবে আমাদেরকে তারা শৈশবে প্রতি-পালন করেছেন।"

যদি আপনার পিতা-মাতাকে শ্রদ্ধা করেন ভালোবাসেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। যদি বিয়ে করেন আপনি ইবাদত করছেন। নবীজি বলেছেন "যে লোক বিয়ে করবে না সে আমার উম্মতের শামিল নয়। স্ত্রীকে ভালোবাস ও ইবাদত। পবিত্র কোরআন বলছে (সূরা নিসা, আয়াত নং ১৯) যে, "তোমার স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, যদিও তুমি তাকে অপছন্দ করো।" যদি স্ত্রীকে আপনার অপছন্দ হয় তবু ও পবিত্র কোরআন বলছে তার সাথে সৎভাবে জীবনযাপন কর। যদি ব্যভিচার থেকে বেঁচে থাকেন তাহলে আপনি ইবাদত করছেন। পবিত্র কোরআন (সূরা ইসরা বনী ইসরাঈল, আয়াত নং ৩২) বলছে−

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا ـ

অর্থ : "তোমরা যিনার নিকটবর্তী হয়ো না। এটা খারাপ কাজ। আর অন্য খারাপ কাজের পথ খুলে দেয়।"

যদি ভদ্রভাবে পোশাক পরেন আপনি ইবাদত করছেন। কোরআন প্রথমে যে ইবাদতের কথা বলছে যেটা পুরুষের। (সূরা নূর, আয়াত নং ৩০)।

"মুমিন লোকদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি জঘন্য করে ও লজ্জা স্থানের হেফাজত করে।"

যখন কোনো পুরুষ কোনো মহিলার দিকে তাকায় এবং তার কোনো রকম খারাপ চিন্তা, বাজে চিন্তা মাথায় আসে, সে দৃষ্টি অবনত করবে। এটা হলো পুরুষের হিজাব। আর পবিত্র বাইবেলে যীশুখ্রিস্ট একই রকম কথা বলেছেন (গসপেল অভ্ মোথিও, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ২৭-২৮)- এ আছে, "প্রাচীনকাল থেকে বলা হচ্ছে তোমরা ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। আর এখন আমি তোমাদের বলছি 'যদি কোনো পুরুষ কোন মহিলার দিকে কোনো লালসার দৃষ্টিতে তাকায় তাহলে সে মনে মনে ব্যভিচার করে ফেলেছে। "তাহলে যীশুখ্রিস্ট নিজেই বলেছেন, 'তোমরা কোনো মহিলার দিকে লালসার দৃষ্টিতে তাকাবে না।' কুরআন এরপর (সূরা নূর এর ৩১ নং আয়াতে) মহিলাদের হিজাবের কথা বলা হয়েছে, 'মুমিন নারীদের বলো, দৃষ্টি সংযত রাখে, লজ্জা স্থান হেফাজত করে, যেটা সাধারণত প্রকাশ থাকে সেটা বাদে আভরণ প্রকাশ না করে। মাথার কাপড় দিয়ে গ্রীবাও বক্ষদেশ ঢাকবে। তবে নিজের স্বামী, বাবা ছেলে বা আত্মীয়-স্বজন যাদের বিয়ে করা যাবে না তাদের সামনে ছাড়া" আর হিজাব পালনের ৬টি নিয়ম আছে।

সহীহ্ হাদীস ও পবিত্র কোরআনে উল্লেখ আছে, প্রথম নিয়ম হলো পুরুষ ও মহিলাদের ক্ষেত্রে, পুরুষরা নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত আর মহিলার পুরো শরীরটাকেই ঢেকে রাখবে। নারীর যে অংশটা দেখা যেতে পারে তাহলো মুখমণ্ডল আর হাতের কব্জি পর্যন্ত। চাইলে এগুলোও ঢেকে রাখতে পারেন। ২য় নিয়ম হলো তারা যে পোশাকগুলো পড়বে তা শরীরের অঙ্গ বোঝার মতো টাইট হবে না। ৩য় নিয়ম এমন স্বচ্ছ হবে না যা ভেতর থেকে দেখা যায়। ৪র্থ নিয়ম হলো এমন হবে না যেন বিপরীত লিঙ্গ আকৃষ্ট হয়। ৫ম নিয়ম অবিশ্বাসীদের মতো পোশাক হবে না। ৬নং পোশাকটি বিপরীত লিঙ্গের মতো হবে না। আর বাইবেলেও একই রকম কথা রয়েছে। (বুক অভ্ ডিওটোরনমি, অধ্যায় ২২, অনুচ্ছেদ ৫) বলছে যে, "মহিলারা এমন কোনো পোশাক পরবে না যা পুরুষরা পরে থাকে। আর পুরুষরা এমন কোনো পোশাক পরবে না যা মহিলারা পরে থাকে।"

হিজাবের বেলায় ঠিক একই রকম বলা কথা আছে, 'আপনারা বিপরীত লিঙ্গের মতো পোশাক পরবেন না।' পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখা যায় পুরুষরা কানে দুল পরে। এক কানে দুল পরে, এটা ইসলামে একেবারে নিষিদ্ধ। এমনকি বাইবেলও এটার বিরুদ্ধে বলে। এটা তারা কেন করে? আমি জানি না। আপনারা বাইবেল পড়লে দেখবেন সেখানে (ফার্স্ট থিমেতিতে, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৯)-এ আছে "মহিলারা পোশাক পরবে ভদ্রভাবে, শালীনভাবে এবং তাদের লজ্জা স্থানের হেফাজত করবে। তারা কোনো মূল্যবান পোশাক, স্বর্ণ দিয়ে বা কারুকাজ করা দুল পরবে না। এছাড়া তারা স্বর্ণ বা মুক্তাও পরবে না সাধারণভাবে থাকবে।" এছাড়া দি ফার্স্ট কাউনথিয়ান্স, অধ্যায় ১১, অনুচ্ছেদ ৫-৬ এ আছে "যে মহিলা তার মাথা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখে না, সে তার মাথাকে অসম্মান করে।" আর ৬নং অনুচ্ছেদ বলছে যে, "যে মহিলা কাপড় দিয়ে তার মাথা ঢেকে রাখে না, তার মাথা কামিয়ে দিতে হবে।"

কোরআন বা হাদীসের কথা নয়, বাইবেলের কথা। যদি যীশু খ্রিস্টের আদেশ মেনে চললে খ্রিস্টান হওয়া যায়, তাহালে আমরা মুসলমানরা খ্রিস্টানদের চাইতে বেশি খ্রিস্টান। লক্ষ করুন মুসলমানদের জন্যে একটা সুন্নাহ হলো খাত্না করা। বাইবেলে একই কথা আছে। পবিত্র বাইবেলের গসপেল অব জন, অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ২২ আছে যে "মূসা তোমাদের দিয়েছেন খাত্না করার একটি নিয়ম। "এক্স এর অধ্যায় ৭, অনুচ্ছেদ ৮ -এ আছে "তোমাদের জন্যে খাত্না করার একটি পদ্ধতি দেওয়া হয়েছে।" গসপেল অব লুক, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ২১-এ আছে "জন্মের ৮ দিন পরে যীশু খ্রিস্টের খাত্না করা হয়েছিল। তাহলে দেখছেন আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মেনে চললেই আপনি ইবাদত করছেন। আমি আগেই বলেছি ইসলাম মানে নিজেকে নিজের ইচ্ছেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করা, আর এ কাজটি যে করে তাকে বলে 'মুসলিম'। আর পবিত্র কোরআনের (সূরা আলে ইমরানের, আয়াত নং ৫২) যে "যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মুসলিম।" একই রকম কথা বাইবেলে (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ৫, অনুচ্ছেদ ৩০) যে "যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, আমার ইচ্ছে নয় আমি আমার পিতার ইচ্ছেকে দেখি। আমি আপনা থেকে কিছু করতে পারি না। আমি সব কিছুর শুধু বিচার করি আর আমার বিচার সঠিক। কারণ এখানে আমি আমার নিজের ইচ্ছেকে দেখি না আমার পিতার ইচ্ছেকে দেখি। আমার ইচ্ছে নয়, মহান স্রষ্টার ইচ্ছে।" যদি এটার আরবি করেন সেটা হবে ইসলাম। আর যে ব্যক্তি ইসলাম মেনে চলেন তিনি হলেন মুসলিম। তাহলে বাইবেলের কথা অনুযায়ী যীশুখ্রিস্ট একজন মুসলিম ছিলেন। আমার আলোচনা শেষ করার আগে পবিত্র কোরআন থেকে একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি।

(সূরা নাহল, আয়াত- ১২৫)

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔

অর্থ ঃ "মানুষকে তোমার রবের দিকে আহ্বান কর হিকমতের ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে তর্ক কর, যুক্তি দেখাও সবচেয়ে উত্তম পন্থায়।"

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ মোঃ ফরিদউদ্দিন, ফিজিওথেরাপির ছাত্র। ইসলাম আর খ্রিস্টান ধর্মে মুক্তি লাভের ন্যূনতম শর্তের মধ্যে কী সাদৃশ্য রয়েছে?

উত্তর ঃ যদি আপনি পবিত্র কোরআন পড়েন দেখবেন সেখানে বলা আছে, একজন মানুষ কীভাবে জান্নাত যেতে পারবে। সূরা আসর আয়াত: ১ - ৩- এ বলা আছে যে, "কালের শপথ। মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান এনে সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের ও ধৈর্য্যের উপদেশ দেয়।" তাহলে যদি কেউ জান্নাত পেতে চান কমপক্ষে ৪টি শর্ত পূরণ করতে হবে। ১. ঈমান ২. সৎকর্ম ৩.মানুষকে সৎকর্মের উপদেশ দেওয়া, ৪. আর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের উপদেশ দেওয়া। এ ৪টি শর্তের যদি একটিও বাদ যায় সাধারণভাবে কোনো লোক জান্নাত পাবে না। যদি আল্লাহ ক্ষমা করেন সেটা আলাদা ব্যাপার। আর এগুলোই হচ্ছে ন্যূনতম শর্ত। আর আল্লাহ যে অপরাধকে কখনোই ক্ষমা করবেন না সেটা আমি আগেও বলেছি (সূরা নিসা, আয়াত: ৪৮-১১৬) সেটা হলো 'শিরক' আর খ্রিস্টান ধর্মে চার্চ যেটা বলে, প্রথমে চার্চ-এর কথা বলছি, তারপর বাইবেলের কথা বলবো।

চার্চ বলে যে, 'যীশুখ্রিস্ট আমাদের পাপের কারণে মারা গেছেন। আমাদের অপরাধের কারণে মারা গেছেন। যদি সেটা বিশ্বাস করেন আপনি মুক্তি লাভ করেছেন। যদি বিশ্বাস করেন যে, যীশুখ্রিস্ট আপনার অপরাধের জন্য ক্রুশবিদ্ধ হয়েছেন, তাহলে আপনি মুক্তিলাভ করবেন। এ প্রমাণটা আপনি বাইবেলেও পাবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হননি। এটার উপর আমার একটা ভিডিও ক্যাসেট রয়েছে, যেখানে প্রমাণ করা হয়েছে যে, যীশুখ্রিস্ট ক্রুসবিদ্ধ হননি।

পবিত্র কোরআন দিয়ে নয়, পবিত্র বাইবেল দিয়েই প্রমাণ করেছি। কোরআন বলে আমরাও তা মানি। এমনকি বাইবেল যদি সঠিকভাবে পড়েন তাহলে দেখবেন বাইবেল একথা বলে না যে যীশু ক্রুসবিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু তবু চার্চ বলে, যদি আপনি মুক্তি পেতে চান তবে এটা বিশ্বাস করতে হবে যীশুখ্রিস্ট আপনার পাপের জন্যে মারা গেছেন। কিন্তু যদি আপনি বাইবেল পড়েন তবে দেখবেন যে, যীশুখ্রিস্ট ঠিক উল্টোটি বলেছেন। গসপেল অভ্ মেথিও অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬-১৮ বলেছে "একজন লোক যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন যে, হে ভালো প্রভু আমাকে বলে দিন কোন কাজটি করলে আমি চিরস্থায়ী জীবন পাব?' যীশুখ্রিস্ট তখন বললেন, 'তুমি আমাকে ভালো বলছ কেন? ভালো শুধুমাত্র একজন তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন। আর স্থায়ী জীবন পেতে হলে, ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।"

তিনি একথা বলেন নি যে, চিরস্থায়ী জীবন পেতে হলে আমাকে ঈশ্বর মানতে হবে। তিনি বলেন নি যে, এটা বিশ্বাস করতে হবে যে আমি তোমাদের পাপের কারণে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মারা গেছি। তিনি বলেছেন যে, চিরস্থায়ী

জীবন পেতে হলে ঈশ্বরের দেয়া নির্দেশগুলি মেনে চলতে হবে। তার মানে আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান, বাইবেল অনুযায়ী আপনাকে ঈশ্বরের নির্দেশগুলো মেনে চলতে হবে। শূকরের মাংস খাওয়া যাবে না, মদ খাওয়া যাবে না, জুয়া খেলা যাবে না, নামায পড়তে হবে। সিজদায় যেতে হবে। সব কিছু আপনাকে মানতে হবে। যদি বলেন, যীশুখ্রিস্টের নির্দেশ মানলেই খ্রিস্টান হওয়া যায় তাহলে আলহামদুল্লাহ। যদিও আমরা মুসলিম আমরা খ্রিস্টানদের চেয়েও বেশি খ্রিস্টান। আর যীশু খ্রিস্টও ছিলেন একজন মুসলমান। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি খাইরুন্নেসা, ব্যাঙ্গালোরের একজন গৃহিণী। যীশু মানুষকে ভালোবাসার কথা বলেছেন, আর মুহাম্মদ তার অনুসারীদের ধর্মের জন্যে যুদ্ধের কথা বলেছেন। এ থেকে আপনার কি মনে হয় না যে, দুটো ধর্মের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে?

উত্তর ঃ বোন, আপনি বলেছেন যে, যীশুখ্রিস্ট সেখানে তার সাথী বলেছেন মানুষকে ভালোবাসতে আর মহানবী সেখানে বলেছেন, প্রয়োজন হলে তোমরা যুদ্ধ করবে ইত্যাদি আর এটাই দুটো ধর্মের মাঝে পার্থক্য। বোন, গসপেল অব মেথিও, অধ্যায় ৫ তে আছে, "এই আইনটা প্রাচীনকালের আইন যে, চোখের বদলে চোখ আর দাঁতের বদলে দাঁত, এটা ছিল মূসা (আ) এর আইন।" তিনি আইনটা এনেছিলেন যদি কেউ আপনার চোখ তুলে ফেললে আপনি তার চোখ তুলে ফেলবেন। সুবিচারের কোনো সুযোগ তখন ছিল না। সে সময় কোনো আদালত ছিল না। আপনি আমার চোখ তুললে আপনারটাও আমি তুলব। চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। সোজা কথা সব কিছু সংক্ষিপ্ত। আদালতে যাওয়ার কোনো দরকার নেই।

কিন্তু যদি কোনো বাচ্চা ছেলে খেলতে খেলতে আপনার চোখে আঘাত করে, বা ভুল করে কেউ আঘাত করে, তখনকি আপনি তার চোখ তুলে নেবেন। কিন্তু এটা আছে গসপেল অব মেথিও, অধ্যায় নং ৫- এ "এটা প্রাচীনকালের নিয়ম চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত। কিন্তু আমি তোমাদের বলছি, যদি কেউ তোমার একগালে চড় মারে, তাহলে তুমি অন্য গালটি বাড়িয়ে দাও। তোমার কাছে কেউ গরম কাপড় চাইলে, তুমি কম্বল দিয়ে দাও। যদি তার সাথে এক মাইল চলতে বলে, তুমি দুই মাইল চলো। মানুষ তখন সেই আইনটা মেনে চলতো। তারা মূসার আইন মেনে চলতো। যীশুখ্রিস্ট এর প্রতিকার চাইলেন আর নতুন আইনের কথা বললেন। যে কেউ একগালে চড় মারলে অন্য গাল বাড়িয়ে দাও। সেটা তখনকার জন্যে ভালো ছিল এখন না।

তবে আমি প্রশ্ন করছি এখনকার দিনে কোনো খ্রিস্টান কি এটা মেনে চলেন? যদি কেউ তার একগালে চড় মারে তবে সে অন্য গাল বাড়িয়ে দিতে পারে। কিন্তু যদি আপনি কোনো ফাদার কিংবা যাজকের কাছে যানা তারপর ফাদার আপনাকে জোরে একটা চড় মারেন আপনি নিজে হয়তো মানুষের সামনে একটা চড় খাবেন কিন্তু চড় অন্য গাল বাড়িয়ে দেবেন না। যাজক যদি ভুল করে আপনাকে চড় মারে আপনি ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি কেউ ইচ্ছে করে চড় মারে আপনি অন্য গাল বাড়িয়ে দেন তাহলে প্রতিদিন সে আপনাকে চড় মারবে। তাহলে মুহাম্মদ (স) তিনি আল্লাহর আরেকজন রাসূল, তিনি বলেছেন, 'তোমরা পরিস্থিতি বিচার করে চলবে।' পবিত্র কোরআন (সূরা বাকারা, আয়াত: ২৫৬) বলেছে' 'লা ইকরাহা ফিদ্দ্বীনে' তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি নেই।'

ইসলাম মধ্য পন্থা অবলম্বনের কথা বলে। যদি ভুল করে আপনাকে আঘাত করে, আপনি তাকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু কেউ যদি ইচ্ছে করে আপনাকে আঘাত করে, আপনিও তাকে আঘাত করুন। ইসলামিক আইন

বলে, যদি কারো উপর অত্যাচার করা হয় আর সে যদি প্রতিবাদ না করে, তাহলে যার উপর অত্যাচার করা হয়েছে সেও সমান অপরাধী। যে অত্যাচার করে তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিৎ, যদি না করে তবে সেও অপরাধী। যেমন ধরুন, কোনো একটা লোক অন্যায় কাজ করছে আর আপনি দেখছেন, সেটা হাত দিয়ে থামান। যদি সেটা না পারেন, তবে মুখে বলুন যদি তাও না পারেন তবে মনে মনে তাকে ঘৃণা করুন। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এখনকার দিনে মুহাম্মদ (সা) আল্লাহর কাছ থেকে যে আইনটা পেয়েছেন সেটা শ্রেষ্ঠ আইন। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : আমি একটি কলেজের থিওলোজিক্যাল। আজকের আলোচনার বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি এখানে যা বললেন তা হচ্ছে দুই ধর্মের মধ্যে পার্থক্য। আমার মনে হয় পার্থক্যের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আপনি বলেছেন যে, যীশু শুধু ইহুদিদের জন্যে এসেছেন। আর মুহাম্মদ পুরো মানবজাতির জন্যে এসেছেন । আমার মনে হয় না এটা সত্য। আর বাইবেলেও এমন কথা বলা হচ্ছে না যা আপনি বলেছেন, 'আমি সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। আমার পিতা এবং আমি এক। যারা আমাকে দেখছো, তারা পিতাকে দেখছো।' আর বাইবেলে পরিষ্কারভাবে লেখা আছে যে, যীশু খ্রিস্ট ঈশ্বর। আর সে কথাটা আমরা বিশ্বাস করি এবং পুরো পৃথিবীর মানুষও বিশ্বাস করে।

উত্তর : কোনো সমস্যা নেই ভাই। আপনি যতগুলো ইচ্ছে আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন। আপনি বলেছেন যে, আজকের অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য। কিন্তু আমি সাদৃশের চেয়ে পার্থক্য নিয়ে বেশি আলোচনা করেছি। লক্ষ করুণ আমি বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়েছি। আমি এখানে বলব যে, ইসলাম ও বাইবেলের মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। আর এখানে আমি সেই মিলগুলোর প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, যেগুলোর কথা বাইবেলও কোরআনে আছে। কিন্তু খ্রিস্টানরা সেগুলো মানে না। আমি এমন কথা বলছি না যে, খ্রিস্টানরা বাইবেল মানছে কি মানছে না। এ বিষয়টা যদি আসে হতে পারে ইসলাম ও খ্রিস্টানদের মধ্যে পার্থক্য। আজকের বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে পার্থক্য নয়। আজকের আলোচ্য বিষয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য বা মিল। খ্রিস্টান ধর্ম আর এ ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য আছে। তেমনি ইসলাম আর মুসলিমদের মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। সে জন্য ভাই আমি আপনাকে মনে করিয়ে দিই যে, আজকের বিষয় ইসলাম আর খ্রিস্টানদের মধ্যে নয় ইসলাম ও খ্রিস্টান ধর্মের মধ্যে সাদৃশ্য।

খ্রিস্টান ধর্মের ভিত্তি হলো 'বাইবেল'। ইসলামের ধর্মীয় গ্রন্থ কোরআন আমি যে সাদৃশ্যগুলো নিয়ে বলেছিলাম সেগুলো কোরআন আর বাইবেল। কোরআন আর বাইবেল দুই-ই নিষেধ করছে শূকর খেও না, কিন্তু খ্রিস্টানরা খায়, আর মুসলিমরা খায় না। কোরআন আর বাইবেল দুই নিষেধ করছে, তোমরা মদ খেও না, খ্রিস্টানরা খায়, মুসলিমরা খায় না। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, তোমরা এক ঈশ্বরের উপাসনা কর কিন্তু আপনারা ত্রিত্ববাদ বিশ্বাস করেন। যীশু বলেছে, তোমরা আমার উপাসনা করো না। কিন্তু আপনারা তো করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি.....। যদি আপনারা আমার ক্যাসেট দেখেন। আমি এমন কোনো পার্থক্যের কথা বলি নি বাইবেল বলছে কোরআন তার বিরুদ্ধে বলছে। কিন্তু না আমি সাদৃশ্য নিয়ে কথা বলেছি। আমি পার্থক্যের কথা বলেছি সেখানে যেখানে খ্রিস্টান মিশনারিদের আমি বলেছিলাম তারা আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল যে, ডিওটোরনমীর ১৮, সেটা যীশুখ্রিস্ট সম্পর্কে

ভবিষ্যৎবাণী। সেখানে যুক্তি দিতে গিয়ে আমি হযরত মূসা (আ) হযরত ঈসা (আ) -এর মাঝে পার্থক্যটা বলেছিলাম। আপনি বুঝতে পেরেছেন।

যদি ভালো করে লক্ষ্য করেন দেখবেন আমি যে সাদৃশ্যের কথা বলেছিলাম বাইবেল আর কোরআন থেকে সেগুলো খ্রিস্টানও ইসলাম ধর্মের ভিত্তি। এবার প্রশ্নতে আসি। আপনি বলেছেন যে, আমি একটা কথা বলেছি আর সেটা আমি আবারও বলছি– যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কারভাবে পুরো বাইবেলের কোথাও বলেন নি যে 'আমি ঈশ্বর তোমরা আমরা উপাসনা কর।' আপনি তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে যীশু বলেছেন, 'আমিই সত্যি এবং জীবনের একমাত্র পথ। কেউ আমার এবং পিতার মাঝখানে আসবে না। যারা আমাকে দেখছে তারা পিতাকে দেখছে এবং আমি ও আমার পিতা এক।' আপনি কোনো রেফারেন্স ছাড়া তিনটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমি তিনটির রেফারেন্স দিচ্ছি। প্রথম দুটো আছে গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ৬-৯ এ যাচাই করতে পারেন বাইবেলে।

আমি আমার কথা বলছি না বরং বাইবেল থেকে বলছি। আপনি একজন ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক, কলেজে পড়ান, যদি ভুল বলে থাকি, এখানে বাইবেল আছে যাচাই করে দেখেন। তবে ভাই এখানে প্রসঙ্গটা দেখতে হবে। আপনি প্রসঙ্গ ব্যতীত কোনো উদ্ধৃতি দিতে পারবেন না। প্রসঙ্গটা জানতে ১নং অনুচ্ছেদে গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৪, পড়লে বুঝতে পারবেন যীশুখ্রিস্ট নিজে বলেছেন, "আমার পিতার রাজ্যে অনেকগুলো প্রাসাদ রয়েছে, অনেকগুলো প্রাসাদ যদি এরকমটা না হতো, আমি তোমাদের বলতাম না। আমি সেখানে যাচ্ছি তোমাদের জন্য জায়গা তৈরি করতে। আর তোমরা জানো আমি কোথায় যাচ্ছি। থমাস বললো, আমি জানি না আপনি কোথায় যাচ্ছেন। আপনি যেখানে যাচ্ছেন আমরা সে পথ চিনি না। যীশু বললেন, 'আমি সত্য এবং জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আমি আর আমার পিতার মাঝে আসতে পারে না।"

আমি এটার সাথে একমত যে, যীশুখ্রিস্ট জীবনের একমাত্র পথ। এটা তার সময়ে কোনো মানুষ আল্লাহর কাছে যাবে না। যীশু খ্রিস্টকে বাদ দিয়ে। প্রত্যেক নবীই তার সময়ে ছিলেন আল্লাহর পথে সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ। কোনো মানুষ আল্লাহ ও মূসার মাঝখানে আসবে না। আর নবীজি এর সময় তিনি ছিলেন সত্য আর জীবনের একমাত্র পথ এবং এখনো আছে। তাহলে প্রত্যেক নবীর সময়ে তিনি ছিলেন সত্যের পথ। এর সাথে আমিও একমত। এ কথার অর্থ যদি আমাকে অনুসরণ করো তাহলে ঈশ্বরকে মেনে চলছো, তিনি ছিলেন পথ। এরপরও বাইবেলে দেখবেন যীশুকে তার শিষ্যরা বললো যে, 'আমরা তো ঈশ্বরকে দেখিনি।' তখন যীশু তাদের বললেন, যারা আমাকে দেখছো তারা ঈশ্বরকে দেখছো। আমাকে দেখছো মানে যারা আমার নির্দেশ মেনে চলছো তারা আসলে প্রকারান্তে ঈশ্বরকে নির্দেশ মেনে চলছো।"

যদি প্রসঙ্গটা লক্ষ্য করুন প্রথম অনুচ্ছেদে আছে, যীশু বলেন, 'আমার পিতার রাজ্যে অনেকগুলো প্রাসাদ আছে'। তিনি বলেন নি যে আমার রাজ্যে অনেক প্রাসাদ আছে। এক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তিনি মহান ঈশ্বরের কথা বলছেন। একইভাবে সকল নবী রাসূলগণ যে নির্দেশ দিয়েছেন সেগুলো যদি আপনি মেনে চলেন, আপনি পরোক্ষভাবে ঈশ্বরের নির্দেশ মানছেন। আর একথাটা মেনে নিতে আমার কোনো রকম আপত্তি নেই। আপনি আরেকটি অনুচ্ছেদের কথা বললেন যে, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এটা আছে গসপেল জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০ এ।

আর এখানেও আপনাকে প্রসঙ্গটা বলবো, এরপর আপনি বলবেন আপনি মানেন কি না যীশুখ্রিস্ট সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। প্রসঙ্গটা জানতে ২৩ নং অনুচ্ছেদে যান। গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০ অনুচ্ছেদ ২৩-এ "যীশুখ্রিস্ট যখন মন্দিরের সলোমনের বারান্দায় গেলেন, ২৪ নং অনুচ্ছেদ বলছে ইহুদিরা তার চারপাশে একত্রিত হলো। আর বললো আমাদের কতদিন দ্বিধার মধ্যে রাখবেন? আপনি যদি খ্রিস্ট হোন সরাসরি বলুন। ২৫ অনুচ্ছেদ বলছে, "আমি তোমাদের বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর নি। আমি যে কাজগুলো করি আমার পিতার নামে, তারা আমার হয়ে এখন সাক্ষ্য দেবে।" ২৬ অনুচ্ছেদে আছে, "আমি বলেছি কিন্তু তোমরা বিশ্বাস করনি। কারণ তোমরা আমার অনুসারী নও।" ২৭ অনুচ্ছেদে– আছে, 'আমার অনুসারীরা আমার কথা শোনে, আমি তাদের চিনি, তারা আমার অনুসরণ করে।' ২৮ নং অনুচ্ছেদে– আছে, 'আমি তাদের চিরস্থায়ী জীবন দিয়েছি তারা কখনো ধ্বংস হবে না। কেউ তাদের আমার হাত থেকে নিতে পারবে না।' ২৯ অনুচ্ছেদে- আছে, 'আমার পিতা আমাকে যা দিয়েছেন তিনি সবার চেয়ে বড়। কেউ তাদের আমার পিতার হাত থেকে তুলে নিতে পারবে না।' ৩০ অনুচ্ছেদে আছে, 'আমি এবং পিতা এক।' প্রসঙ্গটা পড়লে বুঝতে পারবেন উদ্দেশ্যর দিক থেকে যীশু এবং তার পিতা এক। প্রসঙ্গটি এমন আমার বাবা হলেন একজন ডাক্তার আর আমিও একজন ডাক্তার।

আমি যদি বলি, আমরা দুজন এক, তার মানে কি আমরা দুজন একই লোক? না আমরা পেশার দিক থেকে এক। এর মানে কখনোই এই হয় না যে, আমরা একই ব্যক্তি। এটা খুব পরিষ্কার। তারপরও যদি বলেন, এই দুজনই মাত্র একজন ব্যক্তি আমি বলবো ঠিক আছে। এরপর বাইবেলের পড়েন গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১ এ আছে "আমার পিতা আমার মধ্যে রয়েছে, আমি তোমাদের মধ্যে রয়েছে।" যীশুখ্রিস্ট তার ১২ জন শিষ্যকে বলছে আমরা সবাই এক। যদি এটা একজন ধরেন তবে ১৪ জন ঈশ্বরকে মানতে হবে। মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর ১২ জন শিষ্য। আর আপনি যদি মূল বাইবেলটা পড়েন সেখানে এক শব্দটা দুই জায়গায়ই একই রকম (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩০) এখানে যে এক শব্দটা আছে এই একই শব্দটা আছে (গসপেল অভ্ জন অধ্যায় ১৭, অনুচ্ছেদ ২১) একই শব্দ 'আমার পিতা আমার মধ্যে, আমি তোমাদের মধ্যে 'আমরা সবাই এক।'

এ কথাটার মানে হলো মহান স্রষ্টা, যীশুখ্রিস্ট আর তার শিষ্যদের, তারা একই নির্দেশ দিচ্ছেন। আর এ নির্দেশের ক্ষেত্রে এক সবাই। কিন্তু যদি বলেন, তারা একজন ব্যক্তি তবে ট্রিনিটিকে বদলাতে হবে। অন্য ধারণা লাগবে ১৪ জন ঈশ্বরের। আপনি প্রসঙ্গটা পড়লে বুঝবেন। কিন্তু এটার সাথে একমত না হয়ে, যদি বলেন যে, এখানে একই উদ্দেশ্যের কথা বলা হচ্ছে না তাহলে আপনাকে এটাও মানতে হবে যে যীশুর ১২ জন ঈশ্বর। এরপর আরো দেখেন (গসপেল অভ্, অধ্যায় ১০, অনুচ্ছেদ ৩১) যখন যীশু বললেন, আমি ও আমার পিতা এক তখন ইহুদিরা পাথর মারতে চাইল। আমি বলি, ঠিক আছে মারতে হলে ওজু করে মারুন।'

৩২ নং অনুচ্ছেদে এর উত্তর দেওয়া আছে যে, "যীশু বললেন, আমি আমার পিতার অনেক ভালো কাজ তোমাদের দেখিয়েছি। তোমরা কোন ভালো কাজটির কারণে আমাকে পাথর মারতে চাইছ।" ৩৩ নং এর আছে 'ইহুদিরা বললো, আমরা আপনাকে ভালো কাজের কারণে পাথর মারছি না। আপনাকে পাথর মারছি, কারণ আপনি মানুষ হয়ে ধর্মের অবমাননা করেছেন। নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। এরপর যীশু বললেন (৩৪-৩৫ অনুচ্ছেদ) এটা কি তোমাদের ধর্মগ্রন্থে বলা নেই যে, তোমরাই ঈশ্বর। আর যার কাছে মাহান স্রষ্টার নির্দেশ আসে তবে তাকে

যদি ঈশ্বর বলো ধর্মগ্রন্থের নিয়ম ভাঙা হবে না। একই ধরনের কথা আছে সামস এ ৮২ নং অধ্যায়ের অনুচ্ছেদ ৬-এ আছে যে তোমরা ঈশ্বর' তাহলে যদি আপনি প্রসঙ্গটা পড়েন যীশুখ্রিস্ট কখনো নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। তবে উদ্দেশ্যের দিক থেকে মহান স্রষ্টা ও যীশুখ্রিস্ট একই নির্দেশ দিয়েছেন। আশা করি আপনার উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : একজন লোক একবার যীশুখ্রিস্টকে চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিল। যীশু বলেছিল, ঈশ্বরের নির্দেশ মানো, তখন লোকটি বলেছিল, আমি সারা জীবন ধরে ঈশ্বরের নির্দেশ পালন করে এসেছি। তখন যীশু বললেন, 'তাহলে তোমার সব কিছু ছেড়ে দিয়ে আমাকে অনুসরণ কর।' এ কথাটার অর্থ কী?

উত্তর : আমি আপনাকে রেফারেন্সসহ প্রসঙ্গটা বলছি। মেথিও, অধ্যায় ১৯, অনুচ্ছেদ ১৬ -এ আছে "একজন লোক যীশুখ্রিস্টের কাছে এসে বললেন, হে ভালো প্রভু আমি কোন ভালো কাজটি করলে চিরস্থায়ী জীবন পাব। পরের অনুচ্ছেদে", আছে কেন তুমি আমাকে ভালো বলছ? ভালো কেবল একজন তিনি আমার পিতা যিনি স্বর্গে আছেন।" তুমি চিরস্থায়ী জীবন পেতে হলে ঈশ্বরের নির্দেশ মানো।" এটুকু বলেছিলাম এবং এটুকু যথেষ্ট। তাছাড়া ১৮, ১৯, ২০ অনুচ্ছেদ বলছে, "আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি।" এখন সেই লোক হয়তো জান্নাতুল ফেরদৌস পেতে চায়। সে লোক বলল, আমি আরো বেশি পেতে চাই তাহলে আমাকে কী করতে হবে? আমি ঈশ্বরের নির্দেশ মানি। তখন যীশু বললো, "তোমার কাপড় বিক্রি দাও, সম্পদ বিক্রি করে দাও, অর্থ কড়ি দান করে দাও। এটা বাইবেলে আছে। তোমার সব সম্পদ ত্যাগ করে আমাকে অনুসরণ কর। সে লোক ভাবল এটা কঠিন। খুব কঠিন। অনুসরণ করা মানে সব নবী অনুসরণ করতে বলেছেন। কোরআন বলছে, "আল্লাহর ও তার রাসূলকে মান।" তার মানে কি এখনো নবী নিজেকে ঈশ্বর বলছেন? প্রত্যেক মানুষ নবীকে অনুসরণ করবে।

তার মানে এই নয় যে তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলে দাবি করেছেন। মুহাম্মদ (সাঃ) বলেছেন, মূসা (আঃ) বলেছেন, তাদের অনুসরণ করতে। আল্লাহ নবীদের অনুসরণ করতে বলেছেন। কোনো নবীকে অনুসরণ করা মানে তিনি নিজেকে ঈশ্বর দাবি করেন নি। এবং এর অর্থ আপনি নবীদের নির্দেশ মেনে চলবেন যা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে। যীশু কখনো বলেন নি, আমাকে উপাসনা কর; তিনি বলেছেন, আমাকে অনুসরণ কর। তিনি কখনো বলেন নি, আমি ক্রুস বিদ্ধ হয়ে মারা গেছি এটা বিশ্বাস কর। তিনি বলেছেন, ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলো আর ঈশ্বরের নির্দেশ মেনে চলা ও তার নবীদের কথা মেনে চলা একই কথা। কোনো পার্থক্য নেই। তাহলে প্রসঙ্গটা পড়লে জানতে পারবেন যীশু নিজের মুখে বলেছেন, 'আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে যে নির্দেশ পেয়েছি তা মেনে চলো। তাহলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে। তিনি কখনো বলেন নি যে, আমাকে ঈশ্বর মানলে তোমরা জান্নাতে যেতে পারবে। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : মেরি কস্টা বলছি। আপনি কি পাপের উৎস সম্পর্কে কিছু বলতে পারবেন?

উত্তর : বোন, আমরা ইসলাম ধর্মে কোনো পাপের উৎস সম্পর্কে বিশ্বাস করি না। ইসলাম ধর্ম অনুযায়ী সব শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্ম নেয়। আর কোরআন স্পষ্টভাবে বলেছে যে, "কোনো মানুষ কখনো অন্যের ভার বহন করতে পারবে না।" এখন এই পাপের উৎস সম্পর্কে চার্চ আপনাদের যা শেখায় সে সম্পর্কে বলি। আর বাইবেল কি বলছে সেটাও বলবো। আমি বিভিন্ন ধর্মের ছাত্র হিসেবে দুটি ধারণা বলবো, চার্চ শেখায় ইব (বিবি হাওয়া) আর আদম গন্ধব ফল খেয়েছিলেন। আর ঘটনাটা আপনারা পাবেন বুক অব জেনেসিজ, অধ্যায় ৩ এ তিনি আদমকে প্রলোভন দেখিয়েছিলেন গন্ধব ফল খাওয়ার জন্য। আর এজন্যে মানুষ পাপের ভেতরে জন্ম নেয়।

পবিত্র কোরআনে আদম ও হাওয়ার ঘটনাটা উল্লেখ আছে। পবিত্র কোরআনে এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধু বিবি হাওয়াকে দোষ দেয়া হয়েছে। আর পবিত্র কোরআনের সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ১৯-২৭- এ বলা হয়েছে যে, আদম (আ) আর বিবি হাওয়াকে বারবার সাবধান করে দেওয়া হয়েছিল। বলা আছে, তারা দুজনে আল্লাহর আদেশ অমান্য করেছিলেন। এবং পরে তারা দুজনে অনুতপ্ত হয়েছিলেন। তাদের দুজনের ক্ষমা হয়েছিল। এক্ষেত্রে তারা দুজন এ অপরাধে সমান অপরাধী। কোরআনের এমন কোনো আয়াত নেই যেখানে শুধুমাত্র বিবি হাওয়াকে দোষ দেওয়া হয়েছে। তবে কোরআনের একটি আয়াতে শুধু আদম (আ) এর কথা বলা হয়েছে। (সূরা ত্ব-হা, আয়ান: ১২১) উল্লেখ আছে যে, আদম (আ) আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। তবে যদি পুরো কোরআন পড়েন তাদের দুজনকে সমান অপরাধী মনে হবে।

আর বাইবেলে এই দোষটা শুধু হচ্ছে বিবি হাওয়ার। বুক অভ্ জেনেসিজ, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬ বলছে "সৃষ্টিকর্তা বলছেন, তোমরা নারী, তোমরা এখন থেকে গর্ভ ধারণ করবে, এবং প্রসব বেদনা ভোগ করবে।" তাহলে বাইবেল অনুযায়ী গর্ভধারণ করা একটা শাস্তি। কারণ বিবি হাওয়া আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিলেন। এর সাথে যদি কোরআনের তুলনা করেন তবে দেখবেন গর্ভধারণ নারীকে উপরে তোলে বাইবেলে যত নিচে নামায়। পাপের উৎস সম্পর্কে বলি। তারা যেটা বলে যেহেতু বিবি হাওয়া আদমকে নিষিদ্ধ ফল খেতে প্রলুব্ধ করেছিল তাই মানুষ জাতি পাপের ভেতর জন্ম নেবে। এজন্য প্রত্যেক শিশু পাপী হয়ে জন্মায়। আমি তাদের প্রশ্ন করব, বিবি হাওয়া কি গন্ধব খাওয়ার আগে কাউকে জিজ্ঞেস করেছিল।

যদি কেউ তাকে বলত হে! খাও, তাহলে সে দায়ী থাকত। আর আদম কি কাউকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তারা এ ফল খাবেন কি না? তারা যেহেতু কাউকে জিজ্ঞেস করে খাননি তবে কেউ দায়ী থাকবে কেন? এটা একেবারে অযৌক্তিক। তাই বলছি এটার জন্যে কেউ দায়ী নয়। কিন্তু খ্রিস্টান চার্চ শেখায় যেহেতু হাওয়া ঈশ্বরকে মানেন নি, আদম হাওয়া দুজনে মানেন নি, এবং হাওয়ার কারণে মানেন নি। তাই মানুষ জাতি পাপের মধ্য দিয়ে জন্মনেয়। আর এখানে তারা যেটা বলে যে, সৃষ্টিকর্তা এ কারণে তার নিজের পুত্রকে উৎসর্গ করেছেন। তারা এখানে বলে যে, (গসপেল অভ্ জন, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ১৬) "ঈশ্বর পৃথিবীকে এতোই ভালোবাসেন যে এরজন্য একমাত্র সন্তান উৎসর্গ করেছেন। যারা এটা বিশ্বাস করে তারা মারা কখনো যাবে না, চিরস্থায়ী জীবন পাবে। এই 'সন্তান' শব্দটা মূল বাইবেলে ছিল না বলে ধারণা করেন ৩২ জন প্রথম শ্রেণীর খ্রিস্টান বিশেষজ্ঞ। তারা বলেছেন, মূল বাইবেলে এই 'সন্তান' শব্দটা ছিল না। লক্ষ করুন চার্চ আমাদের শেখায় প্রত্যেক মানুষ পাপী হয়ে জন্মনেয়। তারা আরো বলে, যে আত্মা পাপ করে সে মারা যাবে।

আর এটা বাইবেলের উদ্ধৃতি, আমিও একমত, এটা আছে (ইজিকিয়েল, অধ্যায় ১৮, অনুচ্ছেদ ২০)- যে আত্মা পাপ করবে সে আত্ম মারা যাবে। তবে এ কথাটা কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। পরে আছে "ভালো লোকের ভালো কাজ তার সাথে থাকবে, আর মন্দ লোকের মন্দ কাজ তার সাথে থাকবে। পিতা তার পুত্রের অপরাধের দায় বহন করবে না। পুত্রও তার পিতার দায় বহন করবে না।" বাইবেল বলছে পাপ করলে আত্মা মারা যাবে। ভালো লোকের ভালো কাজ তার সাথে থাকবে, মন্দ লোকের মন্দ কাজ তার সাথে থাকবে। কিন্তু কেউ যদি ঘুরে দাঁড়ায়, সে মারা যাবে না। পুরো অনুচ্ছেদটি এমন কথা বলছে। তার মানে বাইবেলের কথা মতে পাপ জন্ম থেকে আসে না। চার্চ যেটা বলে পাপ জন্ম থেকে আসে সেটা বাইবেলের বিরুদ্ধে। খ্রিস্টান ধর্মের শিক্ষণীয় বিষয় কী? সেটা জানতে হবে বাইবেল থেকে।

কিছু মুসলিম লোক নারীদের ছোট চোখে দেখে তার মানে এই নয় যে, ইসলাম নারীদের ছোট চোখে দেখে। ইসলাম কীভাবে নারীদের মূল্যায়ণ করে সেটা জানতে কোরআন ও হাদীস পড়ুন। সে জন্যে যে কোনো বাইবেল দেখেন, যেখানে পাপের কোনো উৎস নেই। বাইবেল অনুযায়ী ছেলে তার পিতার পাপের দায় বহন করবে না তাহলে আমরা কীভাবে পাপী হয়ে জন্মালাম? ইসলাম বলছে প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। যেকোনো ধর্মাবলম্বীর ঘরে জন্মাক না কেন শিশু জন্মায় মুসলিম হয়ে। আমাদের নবীজি বলেছেন, প্রত্যেক শিশু নিষ্পাপ হয়ে জন্মায়। আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : আমি সদানন্দ। আমি এখানকার থিওলজিকাল কলেজের অধ্যক্ষ। দুই ধর্মের সমান দখল দেখে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনি এই প্রবাদ কি বলবেন, জনের গসপেল অনুযায়ী 'শব্দটা মাংসে পরিণত হলো', শব্দটা মানুষে পরিণত হলো। আর এখান থেকে আমরা বিশ্বাসটা পেয়েছি যে ঈশ্বর যীশু রূপে পৃথিবীতে এসেছেন। শব্দটা ছিল 'ঈশ্বর'। যা শুরুতে ছিল।

উত্তর : ভাই আপনি বাইবেল থেকে একটি সুন্দর উদ্ধৃতি দিলেন। এটি আছে (অনুচ্ছেদ ১, অধ্যায় ১, গসপেল অভ্ জন)। আর আমিও আপনার মতে একমত যে, শুরুতে যে শব্দটা ছিল তা ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে। আর শব্দটা ছিল ঈশ্বর। আপনারা যদি বাইবেল পড়ে বুঝতে না পারেন তবে বিষয়ের গভীরে যান। আপনার সাথে আমিও একমত। যীশুখ্রিস্ট হিব্রু ভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু মূল বাইবেল গ্রিক ভাষায় রচিত। যীশুখ্রিস্ট এটা নিজ হাতে লেখেন নি। যদি গ্রিক ভাষা পড়েন দেখবেন সেখানে যেটা প্রথমে ছিল তা হলো ঈশ্বরের সাথে। আর শব্দটাই ছিল 'ঈশ্বর'। প্রথম যখন শব্দটা এলো আর যদি বলেন শব্দটা ছিল ঈশ্বর। এখন এই শব্দটাকে ঈশ্বরের সাথে পাল্টে নেন। শব্দটা দাঁড়াবে শুরুতে ছিল ঈশ্বর। শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে, হয়ে যাবে ঈশ্বর ছিলেন ঈশ্বরের সাথে।

এটা কোনো অর্থ হয় না, ঈশ্বর ঈশ্বরের সাথে ছিলেন। এটা বুঝা খুব কঠিন। আপনাকে আরো গভীরে যেতে হবে। যদি আপনি মূল গ্রিক ভাষায় বাইবেল পড়েন দেখবেন। প্রথমবার যে শব্দটা লেখা আছে, শুরুতে ছিল শব্দটা, আর আর শব্দটা ছিল ঈশ্বরের সাথে। এই ঈশ্বর শব্দটা হলো 'ইতিয়াস' অর্থাৎ 'দি গড'। বড় হাতের G (জি)। ২য় বার শব্দটা ছিল ঈশ্বর এটা হলো 'টনথিয়স'। 'টনথিয়াস' অর্থাৎ আমাদের গড। ছোট হাতের G (জি) অর্থ একজন মহান ব্যক্তি। কিন্তু এখন যদি বাইবেল দেখেন দুই জায়গাতে বড় হাতের G (জি)। এখানে কে ভুল করেছে মহান স্রষ্টা করেন নি, করেছেন বাইবেলের অনুবাদকরা। গ্রিক ভাষায় প্রথম শব্দটা হলো 'ইতিয়াস', ২য়টি হলো 'টনথিয়াস'। তাহলে দুই জায়গাতে বড় হাতের G (জি) কেন? আপনারা কাকে ঠকাচ্ছেন? বলার জন্যে দুঃখিত। তাহলে শুরুতে ছিল শব্দটা, ছিল ঈশ্বরের সাথে, 'মহান ঈশ্বর'।

আর ২য়টি ছিল ঈশ্বর। মানে ঈশ্বরের দূত। আমরাও মানি। কোরআন বলছে যীশুখ্রিস্ট ছিলেন আল্লাহ তাআলার প্রেরিত দূত। আল্লাহ রাসূল। আর আল্লাহর তায়ালার প্রত্যেক দূত আল্লাহর কথা বলেন। তাহলে এ কথাটা মেনে নিতে আমার কোনো আপত্তি নেই যে, যীশুখ্রিস্ট ছিলেন মহান গড। অর্থাৎ ছোট হাতের G (জি)। আর আপনারা ওল্ড টেস্টামেন্ট পড়লে দেখতে পাবেন সেখানে বলা হয়েছে "মুসাকে ফারাওদের কাছে ঈশ্বর হিসেবে পাঠানো হয়েছে।" ঈশ্বর মানে কী? তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন? তাকে পাঠানো হয়েছে ঈশ্বরের একজন দূত বা প্রতিনিধি হিসেবে। কিন্তু মূল ধর্মগ্রন্থটা আমাদের কাছে আছে। সেটার সঠিক অনুবাদ হবে মহান ব্যক্তি। প্রসঙ্গটা ভালোভাবে দেখলে বুঝতে পারবেন, কথাটার সঠিক অনুবাদ হবে যীশুখ্রিস্ট ছিলেন একজন মহান ব্যক্তি।

আর শব্দটা মাংসে পরিণত হলো। অর্থাৎ যীশুখ্রিস্ট পৃথিবিতে এসেছেন রক্ত মাংসের মানুষ হিসেবে। আর যীশুখ্রিস্ট পরিষ্কার করে বলেছেন (গসপেল অভ্ লুক, অধ্যায় ২৪, অনুচ্ছেদ ৩৬) তিনি যখন উপরের ঘরে উঠে সবাইকে "সালামালাইকুম" বললেন তখন সবাই তাকে দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা ভেবেছিল যীশুখ্রিস্ট ক্রুস বিদ্ধ হয়ে মারা গেছেন। তারা এটা বিশ্বাস করতে পারল না। যীশু বললেন, তোমরা আমাকে ছুঁয়ে দেখ।

কারণ আত্মার কোনো শরীর থাকে না যেমনটা আমার কাছে। অর্থাৎ তিনি রক্ত মাংসের মানুষ ছিলেন। তারপর বললেন, এখানে কি খাওয়ার মতো কিছু আছে? তারা তাকে মধু দিল, আর তিনি খেলেন। কী প্রমাণ করতে? এটা প্রমাণ করতে যে তিনি ঈশ্বর নন, ক্রুসবিদ্ধ হন নি, জীবিত ছিলেন। আর কোনো সমস্যা থাকলে মূল গ্রন্থটা পড়েন, তাহলে বুঝতে পারবেন সত্যটা আসলে কী? আশা করি উত্তরটা পেয়েছেন।

প্রশ্ন : এ ব্যাপার কী বলবেন যে টমাস বলেছেন "তিনি আমার প্রভু, আমার ঈশ্বর।"

উত্তর : ভাই, আপনি আরো একটি উদ্ধৃতি আনলেন। একশো উদ্ধৃতি আনতে পারেন। আমার কথা হলো প্রথম যে উদ্ধৃতিটি আমি দিয়েছি সে ব্যাপারে কি আপনি একমত? প্রথমটা মানলে আমি পরের অনুচ্ছেদে যাব। তবে পরের অনুচ্ছেদে যাওয়ার আগে আসুন আমরা সবাই মত বিনিময় করি। এ ব্যাপারে কোরআন বলেছে যে, "এসো সে কথায় যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে এক" আমার ভুল হলে আমি বদলাবো, আপনার ভুল হলে আপনি বদলে বলবেন। আমাদের মাঝের সাদৃশ্যটা দেখতে হবে। সূরা মায়িদার ৮২ নং আয়াতে উল্লেখ আছে। মুসলিম অথবা বিশ্বাসীদের জন্য সবচেয়ে বড় শত্রু হলো, পৌত্তলিক, মূর্তিপূজারি আর ইহুদি। কিন্তু তাদের নিকটতম বন্ধু হলো খ্রিস্টান। আমরা আপনাদের ভালোবাসি। যদি মতের অমিল হয় তবে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবো।

আপনি আরেকটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমিও আপনার সাথে একমত যে টমাস বলেছেন, 'আমার ঈশ্বর'। একটা উদাহরণ দিই, আমি দেরী করলাম একজন লোক আমার কাছে এসে বললো যে, ভাই জাকির, 'আপনি তো লেট, এখন তো অনুষ্ঠান শেষ করে দিতে হবে।' আমি বললাম 'ও মাই গড'। এর মানে কি আমি ঐ লোককে 'ঈশ্বর' বলে ডাকছি? যদি ভালো করে প্রসঙ্গটা দেখেন। যীশু বলছে, 'আমাকে ভালো বলো না' তাহলে তাকে ঈশ্বর বলার ব্যাপারতো এখানে আসছে না। এখানে আমি উত্তেজিত হয়ে বলছি 'ও মাই গড' দেরি হয়ে গেছে তাহলে ব্যাপারটা সবাই বুঝতে পারবে যে আমি লোকটিকে ঈশ্বর বলছি না। টমাস এখানে বলছেন না যে, যীশু তার ঈশ্বর। আর যীশু এটা বলেন নি, মন্তব্যটা করেছেন টমাস। আমি আপনাকে যে চ্যালেঞ্জটা দিয়েছি তা এরকম নয়। আমার চ্যালেঞ্জটা ছিল পুরো বাইবেলে কোথাও এটা পাবেন না যে, যীশু বলেছেন, 'আমি ঈশ্বর আমার উপাসনা কর।' কিন্তু আপনার এই উদ্ধৃতিটি ছিল টমাসের। আশা করি উত্তরটা পেয়েছে।

প্রশ্ন : আমার নাম সোনিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছি। আপনি বললেন যে, মুহাম্মদ (সঃ) এসেছেন পুরো মানবজাতির জন্যে। আর যীশু এসেছেন শুধুমাত্র ইসরাঈলের জন্যে। আমরা খ্রিস্টান ও মুসলিমরা বিশ্বাস করি যীশু আবার পৃথিবীতে আসবেন। সেটা হলে কীভাবে বলবেন যে, মুহাম্মদ বলেন শেষ নবী?

উত্তর : আমিও আপনার সাথে এ ব্যাপারে একমত যে যীশু পৃথিবীতে আবার আসবেন। এর জন্যে সব মিলিয়ে ৭০টির মতো সহীহ্ হাদীস আছে, যে যীশুখ্রিস্ট পৃথিবীতে আবার আসবেন। বাইবেলেও বলা আছে যে,

যীশু ২য় বারের মতো পৃথিবীতে ফিরে আসবেন। আবার পবিত্র কোরআন একথা ও বলছে (সূরা আহ্যাব, আয়াত: ৪০) যে, "মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা নন। বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী। এখন দুটো ঠিক, কীভাবে? ঈসা (আ) তিনি আবারও পৃথিবীতে আসবেন। তিনি কী জন্যে পৃথিবীতে আসবেন? তিনি একমাত্র নবী যাকে আল্লাহ জীবিত অবস্থায় আসমানে তুলে নিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তার অন্য কোনো রাসূলকে জীবিত অবস্থায় তুলে নেন নি। পবিত্র কোরআনে (সূরা নিসা আয়াত: ১৫৮) আছে যে, যীশুখ্রিস্টকে জীবিত অবস্থায় তুলে নেওয়া হয়েছে ১৫৭ নং আয়াতে বলছে, "তারা তাকে হত্যাও করে নি। কিংবা ক্রুশবিদ্ধও করে নি। কিন্তু তাদের মধ্যে এমন বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল যে তারা এ বিষয়ে মতভেদ করেছে এবং তাদের মনেও সংশয় ছিল। তারা শুধু অনুমান করতে পারে। এটা নিশ্চিত যে তারা তাকে হত্যা করে নি।"

আমরা-মুসলিমরা মানি যীশুখ্রিস্ট মারা যাননি, এমনকি বাইবেলও বলছে যীশুখ্রিস্ট জীবিত ছিলেন। হাদীস ও বাইবেল এ ব্যাপারে সমমত পোষণ করে। তবে আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আল্লাহ তায়ালা যীশুখ্রিস্টকে তার নিজের কাছে তুলে নিয়েছেন। কারণ তিনি আল্লাহর পঠিত একমাত্র নবী যাঁকে তার অনুসারীরা ঈশ্বর মনে করে। অন্য কোন নবী রাসূল যেমন– মূসা, নূহ, ইব্রাহিম, আয়জারু, এর অনুসারীরা কেউ বলেননি তাদের নবীরা নিজেকে ঈশ্বর বলেছেন। পবিত্র কোরআনের সূরা মায়িদার ১১৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে যে যীশু বলেছেন, "হে আমার রব, আমার প্রভু আপনি সাক্ষী থাকুন আমি কখনো বলিনি তোমরা আমার উপাসনা কর। বরং আমি বলেছি, আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি আমার এবং তোমাদের ও প্রভু।'

এখন যীশুখ্রিস্ট ঈসা (আঃ) যখন পৃথিবীতে আবার আসবেন, তখন তিনি কোন নবী হয়ে নতুন নির্দেশ নিয়ে নয় বরং শেষ নবী মুহাম্মদ (সঃ)-এর উম্মত হয়ে পৃথিবীতে আসবেন এবং তাঁর অনুসারীদের খ্রিস্টানদের একথাও বলবেন যে, তিনি নিজেকে ঈশ্বর বলেননি।

যেহেতু কোরআনের সূরা মায়িদার ৩নং আয়াতে বলা আছে "আমি আজ তোমাদের দ্বীন পরি পূর্ণ করলাম, এবং ইসলামকে তোমাদের একমাত্র দ্বীন হিসেবে মনোনীত করলাম।" এই কিতাবের পরে আর কোনও নির্দেশ আসবে না। যীশু যখন পুণরায় পৃথিবীতে আসবেন, তিনি মুহাম্মদ (সঃ) এর উম্মত হিসেবে আসবেন। তিনি পূর্বেও মুসলিম ছিলেন, পরেও মুসলিম থাকবেন। আর বাইবেলে আছে গসপেল বলছে, যীশু দ্বিতীয়ার পৃথিবীতে আগমন করলে খ্রিস্টানরা তাকে বলবে, "হে প্রভু আমরা কি তোমার নামে বিস্ময়কর কাজ করিনি।" যীশু তখন তাদের বলবেন, "আমি তোমাদেরকে চিনি না তোমরা সকলেই অপরাধী, তোমরা এখান থেকে চলে যাও।" এই কথাটা অবশ্য গসপেলে নেই। তবে আমার জিজ্ঞাস্য যীশু এই কথা কাদের বলবেন? মুসলিমদের, হিন্দুদের নাকি খ্রিস্টানদের? এর উত্তর হলো যারা বলবে আমরা আপনার নামে বিস্ময়কর কাজ করেছি তাদেরকে বলবেন, তিনি আরো বলবেন, আমি কখনো নিজেকে ঈশ্বর বলিনি, বরং আমি সর্বদা বলেছি আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি আমার প্রভু, তোমার ও প্রভু। আশা করি আপনার উত্তর পেয়ে গেছেন।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম

পবিত্র বাইবেলের দুটি ভাগ-পুরাতন নিয়ম (Old Testament) এবং নতুন নিয়ম (New Testament)। পুরাতন নিয়মে যীশুর পূর্বের বিভিন্ন প্রফেটদের শিক্ষা সম্পর্কীয় অনেকগুলো পুস্তক স্থান পেয়েছে। যেমন, মোজেস, শামুয়েল, আমোষ, হোশেয়, যিশাইয়, মীখা, সফনিয়, জিরমিয়, নহুম, বহককুক, যিহিস্কেল, হগয়, সখরিয় প্রভৃতি প্রফেটগণের পুস্তক। কাজেই পুরাতন নিয়ম একটি গ্রন্থ নয়, গ্রন্থ সমষ্টি। এর গ্রন্থ সংখ্যা উনচল্লিশটি। লোকমুখে প্রচলিত কাহিনী থেকে নানা লেখক নয়শত বৎসরেরও বেশি সময় ধরে এই সকল পুস্তক রচনা করেন।

উনচল্লিশটি খণ্ডে সংকলিত বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি খণ্ডে যে পাঁচটি পুস্তক স্থান পেয়েছেন তাহল– আদি পুস্তক, যাত্রা পুস্তক, লেবীয় পুস্তক, গণনা পুস্তক এবং দ্বিতীয় বিবরণ। তৌরাত বলতে এই পাঁচটি পুস্তক বোঝায়। প্রফেট মোজেসের উপর ঈশ্বর এই পাঁচটি পুস্তক নাযিল করেছেন বলে মনে করা হয় এবং আরও মনে করা হয় যে, মোজেস তোরার এই পাঁচটি খণ্ড নিজে লিখেছিলেন।

পুরাতন নিয়মে বর্ণিত প্রফেটদের সকলে একেশ্বরবাদী ছিলেন। সদা প্রভু ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি একমাত্র উপাস্য– এটা ছিল প্রফেটদের প্রচারের মূল বিষয়। একেশ্বরবাদের প্রচার ও সামাজিক সংস্কার করতে গিয়ে তাঁদেরকে নানা বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে, এমনকি জীবন দিতেও হয়েছে অনেককে। যেমন প্রফেট হোশেয় দুর্নীতিবাজদের ফাঁদে পড়ে প্যাগানদের এক ধর্মীয় বেশ্যাকে বিবাহ করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং ব্যক্তিগত জীবনে চরম অশান্তি ডেকে এনেছেন। প্রফেট জিরমিয় ধর্মবাণী প্রচার করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন। প্রফেট সখরিয়কেও ইহুদিরা হত্যা করেছিল, যিশু-মাতা মেরীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়ার মিথ্যা অপবাদ দিয়ে। (বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান-ড. মরিস বুকাইলি, পৃষ্ঠা ৩৪)।

উল্লেখ্য যে, বাইবেলের পুরাতন নিয়ম তথা, তৌরাত বা তোরার ব্যাখ্যা গ্রন্থ 'তালমুদ' যীশু জননী মরিয়মের (মেরী) বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনে যীশুকে জারজ সন্তান বলে রায়দেন। কুমারীর গর্ভে জন্ম বলে যীশুর বিরুদ্ধে এ 'অভিযোগ। কুরআন অত্যন্ত সুন্দর, শালীন ও মার্জিত ভাষায় ইহুদীদের এ অভিযোগগুলি খণ্ডন করে মরিয়মের সতীত্ব ও যীশুর পবিত্রতা রক্ষা করেছে। কুরআনের ১৯ নং সূরা- 'সূরা মরিয়ম' যীশু- জননী- মরিয়মের নামে অভিহিত।

বাইবেলের নূতন নিয়ম

নূতন নিয়ম গ্রন্থখানিতে মথি, মার্ক, লুক ও যোহনের নামে প্রচারিত চারখানি সুসমাচার, প্রেরিতদিগের কার্যবিষয়ক একখানি গ্রন্থ, বিভিন্ন মণ্ডলী ও বিশ্বাসীগণের নিকট লিখিত একুশখানি পত্র এবং শেষে প্রেরিত যোহনের প্রকাশিত বাক্য সমেত মোট- ৬টি গ্রন্থ ও ২১টি পত্র প্রচলিত আছে।

মোজেস ও ডেভিডের মত যীশু ও একখানি ঐশী গ্রন্থ প্রাপ্ত হন। এই গ্রন্থটি আরামাইক ভাষায় প্রথম নাযিল হয়। আরামাইক হিব্রু ভাষার একটা অংশ বিশেষ। গ্রন্থটির নাম 'ইঞ্জিল' অর্থ সুসমাচার। বাইবেলের নূতন নিয়মে যীশুর জীবনী, তাঁর ধর্মপোদেশ ও ধর্মপ্রচারের কথা বলা হয়েছে। যীশুর মৃত্যুর বহুপর কয়েকজন গ্রীক খ্রিস্টান ধর্মযাজক গ্রীক ভাষায় এই বাইবেল সংকলন করেন। নূতন নিয়ম প্রথম সংকলিত হয় গ্রীক ভাষায়, পরে ইংরাজী ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়।

ত্রিত্ববাদ

বাইবেলের নতুন নিয়মের সুসমাচারগুলি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, তবে বলা আছে ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয় এবং তিনি একমাত্র উপাস্য। "হে ইস্রাঈল শুন! আমাদের ঈশ্বর প্রভু একই প্রভু" (মার্ক ১২ঃ৩০)। এই ঈশ্বর সদা প্রভু একমাত্র উপাস্য। "তুমি তোমার সমস্ত অন্তঃকরণ, তোমার সমস্ত প্রাণ, তোমার মন ও তোমার সমস্ত সত্তা দিয়া তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রেম করবে।" (মার্ক ১২ঃ৩০)। তোমার ঈশ্বর প্রভুকে প্রণাম করবে, কেবল তাঁহার উপাসনা করবে" (লুক ৪ঃ১৮))। ঈশ্বর প্রভু জগতে সর্বব্যাপী নন, তিনি স্বর্গে অবস্থান করেন। "হে আমাদের স্বর্গস্থ পিতা! তোমার নাম পবিত্র বলে মান্য হোক।" (মথি- ৬ঃ১০)।

ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, তাঁর কোন অংশীদার বা সমকক্ষ নেই। তিনি এক পূর্ণাঙ্গ সত্তা। তিনি কাউকেও জন্ম দেননি, কেউ তাঁকে জন্ম দেয়নি অর্থাৎ কেউ তাঁর ঔরসজাত নয় এবং তিনিও কারো ঔরসজাত নন। এই বৈশিষ্ট্যগুলি আল্লাহ্‌র। কিন্তু পবিত্র 'ত্রিত্ববাদ' এক অভিনব মতবাদ! এখানে বলছে পিতা ঈশ্বর (God the Father), পুত্র ঈশ্বর (God the son) এবং পবিত্রাত্মা ঈশ্বর (God the Holy Ghost) এই ত্রয়ীর মিলিত রূপ এক ঈশ্বর। অর্থাৎ, এক যোগ, এক যোগ, এক হলো তিন, তবুও এটা হলো এক।

'The father is one. The son is one and the Holy spirit is one, but the father, the son and the holy spirit are one in deity and equal in glory and eternal majesty' (The person of christ ABD. AL. FADI. page- 72) অর্থাৎ পিতা এক সত্ত্বা, পুত্র এক সত্ত্বা, এবং পবিত্রাত্মা এক সত্ত্বা; কিন্তু পিতা পুত্র ও পবিত্রাত্মার ঈশ্বরীয় সত্তা, মহিমা ও অনন্তমাহাত্ম্য সমান। তাই তাঁরা এক।

"The doctrine of the holy trinity, in no way, means the existence of three gods as some people wrongly imagine. The meaning of the doctrine is God in one." (God is one in the Holy trinity- Zachariah Butrus, page-9) অর্থাৎ 'পবিত্র ত্রিত্ববাদ' কোন ক্রমে তিন ঈশ্বরকে বোঝায় না, ভুলক্রমে অনেকে এরূপ ধারণা পোষণ করেন। এই মতবাদের প্রকৃত অর্থ হল, ঈশ্বর মাত্র একজন। তাঁর নিজের অস্তিত্ব আছে তিনি (ঈশ্বর) নিজেকে পিতা আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বাকশক্তি আছে তাই নিজেকে পুত্র হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ পুত্র তাঁর বাক্য। তাঁর মধ্যে আত্মার অস্তিত্ব আছে তাই নিজেকে পবিত্রাত্মা হিসাবে ব্যক্ত করেছেন। অতএব, ঈশ্বর মাত্র একজন। এটাই 'পবিত্র ত্রিত্ববাদ' নামে পরিচিত। (দ্রঃ যিশুকে ঈশ্বরের বাণীর অবতার বলে গণ্য করা হয়েছে)।

একথা সুস্পষ্ট যে, ঈশ্বরের তিনটি গুণ যথা, অস্তিত্ব (Existence) বাক্‌শক্তি (Speaking ability) ও আত্মা (Spirit)-এর প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা ভাবে এক একটি সত্তায় বিদ্যমান বলে মনে করা হয়েছে এবং প্রত্যেক সত্তাকে ঈশ্বর বলা হয়েছে। চারটি সুসমাচারের মধ্যে মথি, মার্ক ও লুকের সুসমাচারে যীশুকে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করা হয়নি। কেবলমাত্র যোহনের সুসমাচারের প্রথমে যীশুকে ঈশ্বরের বাণীর অবতার বলা হয়েছে। যেমন, "আদিতে বাক্য ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বরের কাছে ছিলেন এবং বাক্য ঈশ্বর ছিলেন।" "আর সেই বাক্য মাংসে মূর্তিমান হলেন।" (যোহন- ১ঃ১ ও ১৪)। "ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখে নি, এক জাতপুত্র, যিনি পিতার ক্রোড়ে থাকেন তিনি (তাঁহাকে) প্রকাশ করেছেন।" (যোহন- ১ঃ১৮)

এটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যীশু কখনো তিন ঈশ্বরের কথা বা ত্রিত্ববাদের কথা বলেননি। "ত্রিত্ব' শব্দটিও তাঁর মুখে কখনো শোনা যায়নি। ঈশ্বর সম্পর্কে তাঁর ধারণা তাঁর পূর্বে আগত অন্যান্য হিব্রু প্রফেটদের ধারণার মতই ছিল। আবার ত্রিত্ববাদ বাইবেলের পুরাতন নিয়মে নেই। এই মতবাদ প্রথম দিকের খ্রিস্টানদের কাছেও অজ্ঞাত ছিল। এই মতবাদ চতুর্থ শতাব্দীর শেষের দিকে খ্রিস্ট ধর্ম বিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

মথি লিখিত সুসমাচারের প্রথম দিকে বলা হয়েছে বার জন শিষ্যকে যীশু এই আদেশ দিলেন, "তোমরা অন্য জাতির পথে যেও না, এবং সমরীয়দের কোন শহরে প্রবেশ করো না। রবং তোমরা ইস্রাঈল কূলের হারানো মেষগণের কাছে যাও।" (মথি ১০ঃ৬)। "ইস্রাঈল কূলের হারানো মেষ ছাড়া আর কারোও নিকট আমি প্রেরিত হইনি।" (মথি ৫ঃ২৪)। এটাই প্রমাণিত হয় যে, যীশু কেবল ইস্রাঈল জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। যীশু যা' প্রচার করতেন তা' তাঁর কাজেও প্রতিফলন ঘটাতেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি একজন অ-ইহুদীকেও খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করেন নি। যীশুর যে বারজন শিষ্য ছিল তারা সকলে তাঁর স্বগোত্রীয়।

মথির সুসমাচারের শেষের দিকে আছে, মৃত্যু থেকে ফেরার পর যীশু এগারজন শিষ্যকে আদেশ করলেন, "অতএব, তোমরা সব জাতিকে শিষ্য কর, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাদেরকে বাপ্তাইজ কর।" (মথি, ২৮ঃ১৯-২০)। শিষ্যগণকে যীশুর উপদেশ অবলম্বন করে এই ত্রিত্ববাদের সূচনা হয় বলে মনে করা হয়। এখানে লক্ষণীয় যে যীশু পিতা, পুত্র ও পবিত্রাত্মার নামে ব্যাপ্তাইজ করতে বলেছেন, তিন ঈশ্বরের কথা বলেন নি। সুসমাচার সমূহে যীশুর যে বাণী লিপিবদ্ধ আছে তা' থেকে প্রমাণিত হয় যে, যীশু নিজের ঈশ্বর হওয়াকে কঠোরভাবে অস্বীকার করেছেন। যেমন, "আর দেখ, এক লোক আসিয়া তাঁহাকে বলিল, হে গুরু। অনন্ত জীবন লাভের পথ।

যোহনের সুমসাচারের সপ্তদশ পরিচ্ছেদের তৃতীয় হতে পঞ্চম বাক্যে যীশু ঈশ্বরের কিছে প্রার্থনায় বলেন, "আর এটাই অনন্তজীবন যে, তারা তোমাকে, একমাত্র সত্য ঈশ্বরকে এবং তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ, তাঁকে, যীশুখ্রিস্টকে জানতে পায়। তুমি আমাকে যে কাজ করতে বলেছ তা করে আমি পৃথিবীতে তোমাকে মহিমান্বিত করেছি।" প্রিয় পাঠক! যীশু এখানে স্পষ্ট বলেছেন যে, অনন্তজীবন লাভ হল ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় হিসাবে এবং যীশুকে তাঁর প্রেরিত পুরুষ বা প্রফেট হিসাবে মান্য করা। ত্রিত্ববাদের উপর যদি অনন্ত জীবন নির্ভর করত তাহলে তিনি তা' প্রকাশ করতে বিরত থাকতেন না।

সুসমাচার সমূহে লিখিত আছে যে, ঈশ্বর হলেন সর্বোচ্চ সত্তা এবং একমাত্র উপাস্য। যীশু সেই সত্তার কাছে প্রার্থনা করেছেন। যেমন, পরে ঘুম ভোরে, রাত্র পোহাবার অনেকক্ষণ পূর্বে তিনি উঠে বাইরে গেলেন এবং নির্জন স্থানে গিয়া প্রার্থনা করলেন। (মার্ক ১ঃ৩৫)। "সেই সময়ে তিনি একদা প্রার্থনা করতে প্রার্থনা করতে পর্বতে গেলেন, আর ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে করতে সমস্ত রাত কাটালেন।" (লুক ৬ঃ ১২-১৩)।

যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তাহলে অন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করলেন একথা ভাবা যায় না।

মার্কের সুসমাচারের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে ৩২ বাক্যে যীশু ঘোষণা করছেন, "সেই দিনের বা সেই দণ্ডের তত্ত্ব কেউ জানে না, স্বর্গের দূতগণও জানে না; পুত্র ও জানে না, শুধুমাত্র পিতা জানেন। এখানে শেষ দিন বা কিয়ামতের (প্রলয়ের) দিনের কথা বলা হয়েছে যে তা একমাত্র ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ জানে না। দ্ব্যর্থহীন ভাষায় যীশু একথা বলেছেন। অন্য সকলের মত তিনি নিজের অজ্ঞতার কথা প্রকাশ করেছেন।

যীশু যদি ঈশ্বর হতেন তাহলে শেষদিন সম্পর্ক তাঁর অজ্ঞতার কথা বলতেন না।

শুধু তাই নয়, ক্রুশ বিদ্ধ হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণায় কাতর অসহায় যীশুর আর্তনাদ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, তিনি কখনও ঈশ্বর হতে পারেন না। "এলোই, এলোই, লামা সাবাক্তানী" অর্থাৎ ঈশ্বর, ঈশ্বর, তুমি কেন আমায় পরিত্যাগ করলে?" (মার্ক ১৫:৩৪-৩৫)। একথা কখনও ঈশ্বরের মুখ থেকে বের হতে পারে না। কেননা ঈশ্বরতো এক সর্বশক্তিমান সত্ত্বা।

সুতরাং প্রকৃত কথা এই যে, যীশু কখনও ঈশ্বর হওয়ার দাবী করেননি। বরং তিনি ঈশ্বর প্রেরিত মহাপুরুষ বা নবী হওয়ার দাবী করেছিলেন। তিনি সম্মান, শ্রদ্ধাও ভক্তি পাওয়ায় যোগ্য, কিন্তু তিনি উপাস্য নন। যীশু সর্বদা নিজেকে ঈশ্বর প্রেরিত প্রফেট বলে বর্ণনা করেছেন। "কারণ, আমি কি বলিব, তাহা আমার পিতা, যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি আমাকে আজ্ঞা করেন। আর আমি জানি যে, তাঁহার আজ্ঞা অনন্তজীবন। অতএব, আমি যা বলি তা পিতা আমাকে যেমন বলেছেন তেমনি বলি।" (যোহন- ১২:৪৯-৫০)।

পবিত্র কুরআনের বাণীর সাথে এই বাণীর ভাবগত ঐক্য লক্ষণীয়। "সে (ঈসা) বলে উঠলো, আমি আল্লাহর বান্দা (দাস), তিনি আমাকে কিতাব করেছেন।" (কুরআন, সুরা মরিয়ম, আয়াত ৩০)।

অতএব, যীশু যে শিষ্যগণকে পিতা পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে ব্যাপ্তাইজ করার কথা বলেছেন তার প্রকৃত অর্থ কি? পিতার নামে ব্যাপ্তাইজের অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি ব্যাপ্তাইজ হচ্ছে সে যেন পূর্ণ হৃদয় ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্তা ও বিশ্বের সার্বভৌম শক্তি হিসাবে মেনে নেয়। পুত্রের নামে ব্যাপ্তাইজের অর্থ হল, সেই ব্যক্তি একথা স্বীকার করে যে, যীশু হলেন ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম। পবিত্র আত্মার নামে ব্যাপ্তাইজ হওয়ার অর্থ হচ্ছে পবিত্র আত্মা এক আধ্যাত্মিক শক্তি, যা' ব্যাপ্তাইজ প্রার্থীর অন্তরে আধ্যাত্মিক শক্তি যোগাবে। পবিত্র আত্মা যে আধ্যাত্মিক শক্তি তা' যীশুর উক্তি থেকে স্পষ্ট হয়। যেমন, পিতা যেমন' আমাকে প্রেরণ করেছেন, তদ্রুপ আমিও তোমাদেরকে পাঠাই। এটা বলিয়া তিনি তাদের উপর ফুঁ দিলেন, আর তাদেরকে (শিষ্যগণ) কহিলেন, "পবিত্র আত্মা গ্রহণ কর।" (যোহন ২০:২১-২২)।

'পিতা যেমন আমাকে প্রেরণ করেছেন' এই বাক্যকটি নির্দেশ করে যে, যীশু একজন প্রেরিত পুরুষ।

অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বর শুধু মাত্র একজন। আর যীশু তাঁর পূর্বে আগত অন্যান্য প্রফেটদের মত ঈশ্বর প্রেরিত জ্ঞানকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার জন্য পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে এই 'ত্রিত্ত্ববাদ' সম্পর্কে বলা হয়েছে "আর একথা বল না যে, আল্লাহ তিনের এক। একথা ত্যাগ কর, তোমাদের কল্যাণ হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য।" (কুরআন, সূরা নিসা, ১৭১ আয়াত)। আবার ২৫৫ আয়াতে বলা হয়েছে "আল্লাহ, তিনি ব্যতীত আর কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, শাশ্বত সত্ত্বা।" (প্রসংগত উল্লেখ্য যে, কুরআন ঘোষণা করছে (শেষ বিচারের দিনে) আল্লাহ বলবেন, "হে মরিয়ম তনয়! তুমি কি লোকদের বলেছিলেন যে, তোমরা আল্লাহ ছেড়ে আমাকে ও আমার জননীকে উপাস্য মান? তিনি (যীশু বা ঈসা (আঃ) বলবেন, তুমি মহিমান্বিত! যা' বলার অধিকার আমার নেই তা' বলা আমার পক্ষে শোভন নয়।" (কুরআন, সূরা মায়েদা, ১১৬ আয়াত)।

অনন্তজীবন ও কর্মফল দিবসের মালিক সম্পর্কে বাইবেল ও কুরআন

মানবজীবনের মূল লক্ষ্য কি? পবিত্র বাইবেল অনন্তজীবন প্রাপ্তিকে মানবজীবনের মূল লক্ষ্য বলে মনে করে। আর অনন্ত জীবন হলো পরম শান্তি, সুখ ও সমৃদ্ধির জীবন যা অনন্তকাল স্থায়ী। পার্থিব জীবন এর প্রস্তুতি পর্ব এবং পারলৌকিক জীবন তা প্রাপ্ত হয়।

বাইবেলের পুরাতন নিয়মানুসারে পার্থিব জীবনে কৃত মানুষের কর্মকাণ্ডের বিচারের পর সৎ কাজের পুরস্কার হিসেবে অনন্তকাল স্থায়ী সুখ ও সমৃদ্ধির জীবন লাভ হয় এবং অসৎ কাজের শাস্তি হিসেবে অনন্তকাল স্থায়ী দুঃখময় জীবন লাভ হয়। "যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরবে। পিতার অপরাধ পুত্র বহন করবে না। ধার্মিকের ধার্মিকতা তার উপর বর্তিবে ও দুষ্টের দুষ্টতা তার উপর বর্তিবে।" (বাইবেল, যিহিস্কেল, ১২ঃ২০)। "যারা ভাল কাজ করেছে তারা অনন্ত জীবন পাবার জন্য উঠবে, আর যারা অন্যায় কাজ করেছি, তারা আযাব ভোগ করার জন্য উঠবে।" (ইঞ্জিল শরীফ, ইউহোন্না, ৫ঃ২৯-৩০)।

বাইবেল এবং কুরআনের বাণীর মধ্যে ভাবগত ঐক্য লক্ষ্যণীয়।

"সেদিন (কর্মফল দিবসে) মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, কারণ তাদের কৃতকর্ম তাদের দেখান হবে। কেউ সামান্য পরিমাণ সৎকাজ করলে সে তা' দেখতে পাবে এব কেউ অনুপরিমাণ অসৎ কার্য করলে সে তাও দেখতে পাবে।" (কুরআন, সূরা জিল্‌-জাল্‌, ৬-৮)

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম ও কুরআন অনুসারে কর্মফল দিবসের একচ্ছত্র অধিপতি হবেন ঈশ্বর স্বয়ং।

কুরআনেও আল্লাহ অনন্ত জীবনের প্রতিশ্রুতি দান করেছেন "নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছি ও সৎ কর্ম করেছে তাদের জন্য আছে ফিরদাউসের (স্বর্গের) উদ্যান। সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। এর পরিবর্তে তারা অন্য স্থান কামনা করবে না।" (সূরা, কাহাফ, ১০৭ আয়াত)।

অনন্ত জীবন লাভের জন্য সুসমাচারগুলিতে যীশু বহু উপদেশ দান করেছেন। আমরা এখানে তাঁর কিছু কিছু উপদেশ তুলে ধরছি। এক লোক তাহাকে বলিল 'হে গুরু! অনন্ত জীবন লাভের জন্য আমি কেমন সৎ কর্ম করব? তিনি তাঁকে আমাকে সত্যের বিষয় কেন জিজ্ঞাসা কর? সৎ একজন মাত্র আছেন। কিন্তু 'যদি তুমি অনন্ত জীবনে প্রবেশ করতে চাও, তবে আজ্ঞা তাঁর সকল পালন কর। সে বলল কোন্ কোন্ আজ্ঞা? যীশু বললেন নর হত্যা করিও না, ব্যভিচার করিও না, চুরি করিও না, মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না, পিতাও মাতাকে সমাদর করিও এবং তোমার প্রতিবেশীকে ভালোবাস।" যীশু দরিদ্রগণকে দান করার জন্য উপদেশ দিলেন। কারণ ধনবানের পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা দুষ্কর। "আবার তোমাদেরকে বলছি, ঈশ্বরের রাজ্যে ধনবানের প্রবেশ করা অপেক্ষা বরং সূচীর ছিদ্র দিয়া উটের যাওয়া সহজ।" (মথি, ১৯ঃ২৩-২৫)।

তাঁহার শিষ্য পিতর তাঁহাকে বললেন, সবকিছু পরিত্যাগ করে আপনার পশ্চাৎগামী হয়েছি, আমরা তবে কি পাব? যীশু তাদেরকে বললেন, "আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, পুনঃ সৃষ্টিকালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসে ইস্রাঈলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে। আর যে ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা; কি ভগ্নি; কি পিতা; কি মাতা; কি সন্তান; কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে সে তাহার শতগুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে।" (বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি- ১৯ঃ২৭-৩০)।

স্বর্গরাজ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে? এর জবাবে তিনি একটি শিশুকে নিজের কাছে ডেকে তাঁদের মধ্যে দাঁড় করালেন এবং বললেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলছি- "তোমরা যদি না ফির ও শিশুদের মত না হও, তবে কোন মতে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাবে না। অতএব, যে কেহ নিজেকে এই শিশুর মত নত করে, সেই স্বর্গরাজ্যে শ্রেষ্ঠ।" (বাইবেল নতুন নিয়ম, মথি- ১৮ঃ২-৫)।

অনন্ত জীবন প্রাপ্তি সম্পর্কে মথি তাঁর সুসমাচারে আরও বলেছেন, যখন মনুষ্যপুত্র (যীশু) সমুদয় দূত সাথে করে আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসবেন, তার সমুদয় অনুসারী তাঁর সামনে এক হবে, "আর তিনি ধার্মিকদেরকে নিজের দক্ষিণ দিকে রাখিবেন ও পাপিদেরকে নিজের বাম দিকে রাখবেন। তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকস্থিত লোকদিগকে বলবেন, এস, আমার পিতার আর্শীবাদ প্রাপ্তরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য বরাদ্ধ করা হয়েছে, তাহার অধিকারী হও। কেননা আমি ক্ষুধিত ছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়েছিলে. পিপাসিত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে পান করিয়েছিলে, অতিথি হয়েছিলাম, আর তোমরা আশ্রয় দিয়েছিলে, বস্ত্রহীন হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে বস্ত্র পরিয়েছিলে, পীড়িত হয়েছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়েছিলে, কারাগারস্থ হয়েছিলাম, আর আমার কাছে এসেছিল। তখন ধার্মিকেরা উত্তরে বলবে। প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখে ভোজন করিয়েছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখে পানি পান করেছিলাম? কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখে আশ্রয় দিয়েছিলাম, কিংবা বস্ত্রহীন দেখে বস্ত্র পরিয়েছিলাম? কবে বা আপনাকে পীড়িত কিম্বা কারাগারস্থ দেখে আপনার কাছে গিয়েছিলাম? তখন রাজা উত্তরে বলবেন, আমি তোমাদেরকে সত্য, আমার এই ভ্রাতৃগণের, এই ক্ষুদ্রতমদের মধ্যে একজনের প্রতি যখন এটা করেছে তখন আমার জন্য এটা করেছে। পরে তিনি বামদিকের লোদেরকে বলবেন, ওহে শাপগ্রস্থর! আমার কাছ থেকে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রজ্জলিত করা হয়েছে তার মধ্যে যাও। কেননা, আমি ক্ষুধিত হয়েছিলাম, আর তোমরা আমাকে খাবার দাও নি। পিপাসিত হয়েছিলাম আর তোমাকে পান করাও নি; অতিথি হয়েছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দাও নি। বস্ত্রহীন ছিলাম, তোমরা আমাকে বস্ত্র পরাও নি পীড়িত, কারাগারস্থ ছিলাম, আর আমার তত্ত্বাধান কর নি। তখন তারাও উত্তর করবে, বলবে, প্রভু! কবে আপনাকে ক্ষুধিত, কি পিপাসিত, কি অতিথি, কি বস্ত্রহীন, কি পীড়িত, কি কারাগারস্থ দেখে আপনার পরিচর্য্যা করি নি? তখন তিনি উত্তরে বলবেন; আমি তোমাদেরকে সত্য, তোমরা এই ক্ষুদ্রতমদের কোন একজনের প্রতি এখন এটা কর নি, তখন আমার প্রতি কর নি। পরে পাপীরা অনন্তদণ্ডে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।" (বাইবেল, নতুন নিয়ম, মথি- ২৫ঃ৩৩-৪৬)।

অতীত উচ্চ নৈতিক আদর্শের কথা এখানে উঠে এসেছে। মানবের প্রতি প্রেম প্রীতি ও ভালবাসা তথা মানবসেবা যে প্রকৃত ঈশ্বর সেবা এই সত্যটি যীশু এখানে তুলে ধরেছেন।

তুলনীয়,

১। সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিজন।

সে তাঁর পরিজনকে ভালবাসে,

যে আল্লাহকে ভালোবাসে।

(হাদীস, বায়হাকী)।

বাইবেল অনুসারে জীবনের পরমলক্ষ্য অনন্ত জীবন পাপ্তি এবং এই জীবন প্রাপ্তির জন্য ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন অপরিহার্য। বাইবেলের নতুন নিয়ম ঘোষণা করে কর্মফল দিবসে যীশু হবেন সমগ্র মানব জাতির বিচার কর্তা এবং তাঁর দ্বাদশ শিষ্য হবে ইহুদিদের দ্বাদশ বংশের বিচারকর্তা। যেমন, "পিতা কারোও বিচার করেন না, কিন্তু সমস্ত বিচারভার পুত্রকে দিয়েছেন।" (বাইবেল, যোহন, ৫ঃ২২) তাঁর দ্বাদশ শিষ্য সম্পর্কে যীশু বলেন, "আমি তোমাদেরকে সত্য বলছি, পুনঃসৃষ্টি কালে যখন মনুষ্যপুত্র আপন প্রতাপের সিংহাসনে বসবেন, তখন তোমরাও দ্বাদশ সিংহাসনে বসে ইস্রাঈলের দ্বাদশ বংশের বিচার করবে।" (মথি- ১৯ঃ২৮-২৯)। কিন্তু বাইবেলের পুরাতন নিয়মমতে, ইস্রাঈলকুলের বিচারকর্তা হবেন সদাপ্রভু। "অতএব, হে ইস্রাঈল কুল! আমি তোমাদের প্রত্যেকের আচার ব্যবহার অনুযায়ী তোমাদের বিচার করব। এটা প্রভু, সদাপ্রভু বলেন।" (বাইবেল পুরাতন নিয়ম, যিহিস্কেল- ১৯ঃ৩০)। এটাই বাইবেল- এর পুরাতন নিয়মের সাথে নূতন নিয়মের মতপার্থক্য।

বাইবেলের মত কুরআনও কর্মফল দিবসে বিশ্বাসী, কিন্তু ঐ দিবসের বিচারক সম্পর্কে কুরআন ভিন্ন ধারণা পোষণ করে। কুরআনের মতে কর্মফল দিবসের বিচারকর্তা একমাত্র আল্লাহ। বিচার শেষে আল্লাহ মানুষকে সৎ মানুষকে কর্মফল অনুযায়ী অনন্তকাল স্থায়ী স্বর্গীয় জীবন দান করবেন, অথবা অসৎদেরকে নারকীয় জীবন দান করবেন। কর্মফল দিবসের বিচারকর্তা যে আল্লাহ একথা কুরআনের বহুস্থানে এসেছে। কুরআনের প্রথম সূরা, সূরা 'ফাহেতা'য় বলা হয়েছে, "সকল প্রশংসা বিশ্বজগত সমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য, যিনি পরম দাতা ও পরম দয়ালু, বিচার দিনের মালিক ।" (কুরআন, সূরা, ফাতেহা, ১-৩ আয়াত)। 'কর্মফল দিবস সম্পর্কে তুমি কি জানঃ সেদিন সমস্ত কর্তৃত্ব হবে আল্লাহ তায়ালার।" (কুরআন, সূরা ইন্‌ফিত্বর, ১৭-১৮) আয়াত)। "সেদিন শুধু মানুষ কেন স্বর্গীয় দূতগণেরও কোন কর্তৃত্ব থাকবে না। সেদিন জিব্রাইল ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবেন। দয়াবান যাকে অনুমতি দেবেন সে ছাড়া অন্যরা কথা বলবে না এবং সে যথার্থ বলবে। এদিন সুনিশ্চিত।" (কুরআন, সূরা নাবা, ৩৮-৪০ আয়াত)।

সুতরাং যীশু এবং যীশুর দ্বাদশ শিষ্য যে বিচার দিবসের বিচার কর্তা হবেন বাইবেলের ঐ ঘোষণা কুরআন আদৌ সমর্থন করে না। সেদিন পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কর্তত্বের মালিক হবেন একমাত্র মহান আল্লাহ, অন্য কেহ নন।